দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

প্রথম বর্ষ ❖ ২০ তম সংখ্যা ❖ ২ জানুয়ারি ২০২৫

➲এই সংখ্যায় থাকছে

- মনমোহন সিং, বিদগ্ধ অর্থনীতিবিদ ও একজন বিরল রাজনৈতিক নেতা ২
- ভারতের উদারনৈতিক অর্থনীতির রূপকার ডঃ মনমোহন সিং আর নেই ৩
- 'মাহমুদ মন্দির ধ্বংস করেছে, শিয়াদের মসজিদও' -- বললেন রোমিলা থাপার ও তিস্তা শীতলবাদ ৬
- বিচারপতির বিদঘুটে বিচার ৮
- শতবর্ষে পদার্পণ করল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১০
- শান্তিনিকেতন ও পৌষ উৎসব ১১
- কাজী আবদুল ওদুদ ও তাঁর বাংলা ১২
- মানুষ মর্মমূলে ধর্ম বিরোধী ১৪

স্মরণ —
- অন্য ধারার চলচিত্রের পুরোধা শ্যাম বেনেগাল ১৫
- পণ্ডিত জাকির হুসেন (১৯৫১-২০২৪) ১৬
- সংবিধান প্রণয়ন : বাবাসাহেব আম্বেদকর ও পন্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৭
- বাংলাদেশে সরকারি মদতে সংবাদম্যাম ও সাংবাদিকদের ওপর ক্রমাগত নারকীয় আক্রমণ ১৯
- বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধর্মান্ধতাকরণ ২০

নববর্ষের শুভেচ্ছা

.....

নাগরিক -এর সকল পাঠক লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে নতুন বছর ২০২৫-এর প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

— সম্পাদকমণ্ডলী নাগরিক

➲সম্পাদকীয়

ধর্ম স্থানের চরিত্র বদল করা যাবেনা

ধর্মস্থানের চরিত্র বদল নিষিদ্ধ করে ১৯৯১ সালে একটি আইন প্রণীত হয়। সুপ্রিম কোর্ট ওই আইন অনুমোদন করে। তাতে পরিষ্কার করে বলা হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট দেশের যে কোনও স্থানে যে ধর্মস্থান আছে তার চরিত্র পরিবর্তন করা যাবে না। শুধুমাত্র বাবরি মসজিদ নিয়ে বিতর্কটি বহু পুরাতন বলে সেটি আদালতের বিচারাধীন থাকবে।

আদালতের নির্দেশের বাইরে ওই ৫০০ বছরের পুরাতন মসজিদ কিভাবে ধ্বংস করা হয় তা সকলেই জানেন। সুপ্রিম কোর্ট অবশেষে ওই মসজিদ স্থলে মন্দির নির্মাণের অনুমতি দিলেও, ওই মসজিদের নিচে কোনও মন্দিরের অস্তিত্ব আছে বলে মানেন নি। তাঁরা রায়ে এ কথাও বলেন যে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা খুব বড় ধরনের ফৌজদারী অপরাধ।

ধর্মস্থানের ভূগর্ভস্থ ইতিহাস খুঁজে বার করবার যে প্রচেষ্টা চতুর্দিকে অশান্তি ও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে তার পিছনে রয়েছে হীন ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। ইদানিং আবার মসজিদের নিচে মন্দির আবিষ্কারের ধুম পড়েছে। বিশেষ করে হিন্দী বলয়ে।

আর আশ্চর্যের বিষয় ১৯৯১ সালের আইন উপেক্ষা করে নিম্ন আদালত সংশ্লিষ্ট মসজিদের নীচে সার্ভে করার নির্দেশ দিচ্ছে। সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের সম্ভলে ৫০০ বছরের পুরাতন মসজিদে সার্ভে করার জন্য সেশন কোর্ট একতরফা নির্দেশ দেয়। তাতে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ আপত্তি জানালে পুলিশ গুলি চালালে ৫ জন নিহত হয়।

এর আগে কাশির জ্ঞান বাপি মসজিদ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়েছে। ১৯৯১ সালের আইনকে উপেক্ষা করে নিম্ন আদালত কী করে সমীক্ষা করার নির্দেশ দেয় তা বোধগম্য নয়। সুপ্রিম কোর্টের তিন সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে বলেছে, ১৯৯১ সালের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও আদালতে ধর্মীয় উপাসনাস্থলের চরিত্র বদল সংক্রান্ত মামলা গ্রহণ করা হবে না। যে সব মামলা চলছে সেগুলি সম্পর্কেও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। ধর্ম স্থানের চরিত্র বিচারের জন্য কোনও সমীক্ষার নির্দেশ দেওয়া যাবেনা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আপাতত স্বস্তি ফিরেছে।

সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯১ সালের আইন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের। অবস্থান জানতে চেয়েছে। এখন দেখার কেন্দ্রের সরকার কী অবস্থান নেয়। তারা মন্দির - মসজিদ নিয়ে অসুস্থ বিতর্ক আহ্বান করবে না কি শান্তি ও সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টি করবে? ভারতবর্ষ সামনের দিকে এগোবে না কী এক পশ্চাৎপদ অসুস্থ সমাজের কাছে আত্ম সমর্পণ করবে ?

সম্পাদক

শান্তনু দত্তচৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

মনমোহন সিং, বিদগ্ধ অর্থনীতিবিদ ও একজন বিরল রাজনৈতিক নেতা

অমিতাভ সিনহা

.....

''আমার গভীর প্রত্যাশা, চলতি শতাব্দীতেই ভারতের সমস্ত মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠবে। দেখা যাবে স্বনির্ভর ভারতকে। সেই ছেলেবেলা থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল শিক্ষার আলোকে যেন আমরা সবাই আলোকিত হয়ে উঠতে পারি। জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়েছি বলেই আমি আজ আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে''। কথাগুলি বলেছেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। এক সাধারণ পরিবার থেকে তিনি এই জায়গায় পৌঁছেছিলেন শুধুমাত্র নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে পেরেছিলেন বলে। তাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

যে গ্রামে তিনি বড় হয়েছেন সেখানে না ছিল স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট বা পানীয় জলের ব্যবস্থা। দেশভাগের পর ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবারের সঙ্গে তিনি এইদেশে চলে আসেন। শিক্ষার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ তাঁকে ক্রমশ আলোকপ্রাপ্ত করেছে। স্কলারশিপ তাঁর শিক্ষা লাভে সহায় হয়েছিল তা তিনি বার বার ব্যক্ত করেছেন। তিনি কখনও তাঁর দারিদ্র্য নিয়ে প্রচার করতে যান নি। তিনিও পন্ডিত নেহেরুর মতন মনে করতেন আধুনিক ভারতের মন্দির হচ্ছে আইআইটি, আইএমএ, এআইএমএস প্রভৃতি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এই নীতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে গণবন্টন, স্বাস্থ্য, পানীয় জল,পরিবহণ, পরিচ্ছন্নতা সব ক্ষেত্রেই উন্নয়নের মাধ্যমে এক শক্তিশালী সমাজ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। এই ছিলেন ড.মনমোহন সিংহ।

তাঁর কোনও পদের মোহ ছিলনা। নিম্নমানের সমালোচকরা তাঁকে 'অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার' বলে বিদ্রুপ করতো। ২০০৪ সালে সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে ইউপিএ সরকার ক্ষমতায় এলে সোনিয়া গান্ধী অন্তরাত্মার আহ্বানে নিজে দেশের প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ না করে যখন মনমোহন সিং-র বাড়িতে যান তখন তিনি বলেছিলেন এই রায় আপনার কঠিন পরিশ্রম ও নেতৃত্বদানের ফল, আপনারই উচিত এই দায়িত্ব নেওয়ার। তিনি রাজী হননি। পরে রাহুল ও প্রিয়ঙ্কাকে নিয়ে আবার ১৯ নং সফদরজং রোডের বাসভবনে গিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে তাঁকে রাজি করান।

পাঞ্জাবের একটি গ্রাম থেকে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা, অর্থমন্ত্রকের সচিব, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর, যোজনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান তারপর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই কংগ্রেস তাঁকে রাজ্যসভায় সাংসদ করেছে। প্রতিটি জায়গায় তাঁর সাফল্য প্রশ্নাতীত।

১৯৯১ সালে নরসীমা রাও সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসাবে তৎকালীন দেশের বেহাল অর্থনীতির সংস্কারের চাহিদামত উদার আর্থিক নীতি গ্রহণ করে যে সংস্কার শুরু করেন তাতে তাঁর সাহসিকতার প্রমাণ মেলে। সেসময় বহু দ্বিধা সত্ত্বেও জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব তাঁকে এই সংস্কার এগিয়ে নিয়ে যেতে যথাযথ সুযোগ করে দিয়েছিল ও সহায়তা করেছিল। নতুন শিল্পনীতিতে লাল ফিতা আলগা করা, লাইসেন্স প্রথা অবসান,বিভিন্ন শিল্পে বিদেশী লগ্নির দরজা খুলে দেওয়া, দেশের বাইরে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞার অবসান তাঁর সময়ে নেওয়া সংস্কারমুখী পদক্ষেপ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সময়ে গ্যাট (GATT) চুক্তি রূপায়ণ করে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সদস্যপদ গ্রহণ সবকিছুতেই ভবিষ্যতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর হাত ধরেই সম্পন্ন হয়,যার ফল দেশ আজ পাচ্ছে। তবে বর্তমান সরকারের ভুল, অদক্ষ ও অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের খেসারত আগামীদিনে যে আমাদের দিতে হবে তাতে সন্দেহ নেই। এই সংস্কারের জন্য তাঁকে কল্যাণকর রাষ্ট্রের সংঘ থেকে বিচ্যুত হতে হয়নি। তাঁর সময়ে আর্থিক বৃদ্ধি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক বৃদ্ধির যে ঢক্কানিনাদ করে থাকেন তার স্থপতি মনমোহন সিং এর নীতি, যার জোরেই আজ পৃথিবীর তৃতীয় শক্তি হিসাবে বা পাঁচ লক্ষ কোটি বিলিয়ন অর্থনীতির দেশ হওয়ার স্বপ্ন মোদী ফেরি করছেন। মনমোহন সিং প্রবর্তিত আর্থিক সংস্কারের হাত ধরে বিশ্ববাজার ব্যবস্থার কক্ষে ভারত স্থান করে নিতে পেরেছো। বিশ্বের বিভিন্ন মঞ্চগুলিতে ভারতীয় নাগরিকদের প্রবল প্রতাপ উত্থান এই সংস্কারের ফলে সম্ভব হয়েছে। সুন্দর পিচাই(আলফাবেট), সত্য নাদেলা (মাইক্রোসধ), পরাগ আগরওয়াল (টুইটর, বর্তমানে হ্যান্ডল এক্স), লীলা নায়ার (চ্যানেল), শান্তনু নায়ার (এডবে), অরবিন্দ কৃষ্ণ (আইবিএম), ইন্দ্র নোয়ি (পেপসিকো) এর মত বহু ভারতীয় পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্থার উচ্চপদে আসীন। এর পেছনে নিশ্চয় নেহেরুর দূরদর্শী সিদ্ধান্ত, আধুনিক ভারতের মন্দির হোক আইআইটি, আইএমএ, এমস, দেশজুড়ে অসংখ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরী ও সেই খাতে বাজেটে বিপুল অর্থ বরাদ্দ করার ভূমিকা অনস্বীকার্য, কিন্তু তার সাথে সংস্কার এই উদ্যোগকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

সরকার পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে অসামরিক পরমানু চুক্তি(ওয়ান টু থ্রি এগ্রিমেন্ট) সম্পন্ন হয় তারই সময়। সরকারের ওপর থেকে বামদলগুলির সমর্থন প্রত্যাহারের সুযোগ নিতে লালকৃষ্ণ আদবানীরা সরকার ফেলার চেষ্টা আজ আর অজানা নয়। আমেরিকার সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক তৈরীর রূপকার তো মনমোহন সিং। বারাক ওবামা থেকে জো বাইডেন বা এন্টনি ব্লিঙ্কেনরা আজ একই কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। গত দুদশকের এই সম্পর্কের স্থায়িত্বের ভিত্তি হচ্ছে তাঁর সময় নেওয়া নীতি। এর ফলে রাশিয়াও রুষ্ট হয়নি কখনও। বিশ্বে যখন প্রবল অর্থনৈতিক মন্দা তখন শক্ত হাতে তা সামলেছেন তিনি, মানুষের মধ্যে তার আঁচ পড়তে দেননি। বিশ্বের তাবড় তাবড় ব্যাঙ্কগুলি যখন দেউলিয়া হয়ে গেল তখন ভারতে কোন ব্যাঙ্কে লালবাতি জ্বলে নি,আমানতকারীদের এক নয়া পয়সাও মার যায়নি। একমাত্র বিদেশী ব্যাঙ্ক গ্লোবাল ট্রাস্ট ব্যাঙ্ক ব্যবসা গুটিয়ে নেয়, কিন্তু আমানতকারীদের অর্থ ফেরতের ব্যবস্থা করেছিল সরকার। ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অব কমার্সের ম্যামে আমানতকারীদের অর্থ ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আজকে আদানিকান্ড ও সেবির চেয়ারপার্সনের যেসব কান্ড সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তাতে আগামীদিনগুলিতে রেড এলার্ট এর আভাস পাওয়া গেলেও আজ আমাদের যে শক্তি অর্জন করেছি তাতে তা সামাল দেওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করি।

জনগণের দাবীমত জাতীয় রোজগার গ্যারান্টি প্রকল্প যা ১০০ দিনের কাজ হিসাবে পরিচিত তা করোনা মহামারির সময় দেশের দরিদ্র মানুষের বেঁচে থাকার রশদ জোগায়। তাঁর সময়ে নেওয়া খাদ্য সুরক্ষা আইন বহু কোটি মানুষের দুবেলা অন্নের সংস্থান করছে। শিক্ষার অধিকার আইন, জঙ্গলের অধিকার আইন, জমি অধিগ্রহন ও পুনর্বাসন আইন, তথ্যের অকির আইন, লোকপাল, আধার কার্ড প্রচলন, পোলিওমুক্ত ভারত সবই তাঁর

সময়ের এক দিকচিহ্ন। গণতান্ত্রিক ভারতে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের রূপ আমরা নেহেরুর আমলেই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। কিন্তু বিশ্বে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর বিশ্বজুড়ে যে বাজার অর্থনীতির দরজা খুলে দেয় তার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে মিখাইল গর্বাচেভের সোভিয়েত রাশিয়া টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল যার রেশ আজও বিশ্বের রাজনীতিতে প্রতিয়মান ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু ভারতের অন্তর্নিহিত শক্তি যা আমরা স্বীনতার ছয় দশক ধরে অর্জন করেছি তা রুখে দিল।

মনমোহনের মত অত্যন্ত ভদ্র ও সৎ মানুষ আজকের রাজনীতিতে যে বিরল তা ইতিমধ্যেই স্বীকৃত। শেষদিন পর্যন্ত তাঁরই অধীনে থাকা মন্ত্রী প্রণব মুখার্জীকে স্যার বলে সম্বোধন করতেন, কারণ তিনি যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ছিলেন তখন তো অর্থমন্ত্রী ছিলেন প্রণব মুখার্জী। এমন শিক্ষিত রাষ্ট্রনেতা বিশ্বের রাজনীতিতে কবে এসেছেন তা নিয়ে গবেষণা হতে পারে।জননেতা না হয়েও তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। একথা সত্য যে তৎকালীন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী তাঁকে সর্বদা সহায়তা করেছেন। ড. সিংহও তাঁকে পাশে পেয়েছিলেন সব সময়, যিনি জনগণের জন্য বিভিন্ন আইন প্রনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহন করেছিলেন, সঠিক পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর দল হিসাবে কংগ্রেসও তাঁকে চোখ বন্ধ করে সমর্থন করে গেছে।

আত্মপ্রচারে বিমুখ মানুষটি সাঙাততন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বহুদেশে, যেমন রাশিয়া,কোরিয়া বা পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে মুষ্ঠিমেয় ব্যবসায়ীরা সরকারের বিশেষ সহায়তায় তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি করে পরবর্তীকালে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে তা যাতে ভারতে না হয় সে ব্যাপারে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। আজকের ভারত সেই সাঙাততন্ত্রের দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়েছে। সেবি ও আদানির গলাগলি সেই দিকনির্দেশ করেছে। একইসঙ্গে রাজনীতিতে মেরুকরণ তাঁকে অবিরত বিচলিত করত।

বিজেপি, আপ এর মত বিরোধীরা তাঁকে দুর্বল প্রধানমন্ত্রী বলে কটাক্ষ করত। মোদীরা মৌনমোহন বলে ব্যঙ্গ করতেন। আজ সেই মোদী পার্লামেন্টে আসেন না, কোনও সাংবাদিক সম্মেলন করেন না। মোদী এখন বলছেন সংকটের সময় অর্থমন্ত্রী হিসাবে দেশের অর্থনীতিতে নয়া দিশা দেখিয়েছিলেন। অমিত শাহ বলছেন, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিয়েছিলেন। রাজনাথ সিং বলেছেন ভারতের অগ্রগতিতে তার ভুমিকা মনে রাখা হবে। আপের নেতারাও তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অথচ এরাই ক্ষমতার লোভে বিজেপির ফাঁদে পা দিয়ে এগার বছর আগে তাঁর বিরুদ্ধে কি কটুক্তি ও মিথ্যা প্রচার করেছিলেন তা সকলেই জানেন। তিনি বার বার ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন কিন্তু কখনও তাদের বিরুদ্ধে কোন কটুক্তি করেননি।

১৯১৪ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর শেষ সাংবাদিক সম্মেলনে ক্রনী ক্যাপিটালিস্টদের এজেন্ট সাংবাদিকরা তাঁকে দূর্বল প্রধানমন্ত্রী বলে যে বিরোধীরা প্রচার করছিল সে সম্পর্কে বিদ্রুপের সঙ্গে প্রশ্ন করছিলেন। এই অসভ্য সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, ''আমি সেরকম শক্তিশালী হতে চাই না যেভাবে আমেদাবাদ বিপর্যয়ে কেউ মুখ্য ভুমিকা নিয়েছিল। তবে আমি বিশ্বাস করি আগামীদিনে ঐতিহাসিকেরা আমার কাজের মুল্যায়ন করবেন ও ইতিহাস এই মিডিয়ার মতন আমার প্রতি এতটা নির্দয় হবে না।'' আজ বোঝা যাচ্ছে তাঁর মতন ভবিষ্যতদ্রষ্টার কথা ইতিমধ্যেই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ❐

ভারতের উদারনৈতিক অর্থনীতির রূপকার ডঃ মনমোহন সিং আর নেই

সৌর বসু

.....

অশোক রুদ্রর (অর্থনীতিবিদ) শান্তিনিকেতনের বাড়িতে আমরা মাঝেমধ্যেই তখন যেতাম। আমাদের পত্রিকা রাঢ় ভূমির ব্যাপারে আলোচনার জন্য। অধ্যাপক মনমোহন সিং অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তার কিছুদিন পরেই আমরা অশোকদার বাড়িতে গিয়েছি। ডঃ মনমোহন সিংয়ের অর্থনৈতিক উদারীকরণের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। আমাদের মধ্যে উগ্র বাম মনোভাবাপন্ন কেউ একজন বললেন আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডারের নির্দেশে ডঃ মনমোহন সিং আমাদের দেশে আর্থিক উদারীকরণ শুরু করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অশোকদা প্রতিবাদ করলেন। বললেন ডঃ মনমোহন সিং ক্ষমতার লালসার জন্য কোন কাজ করবেন না। তিনি যদি বিশ্বাস করে থাকেন আর্থিক উদারীকরণের ম্যামে ভারতবর্ষের উন্নতি সম্ভব তবেই তিনি এই নীতি গ্রহণ করবেন। অশোকদা উগ্র বাম পন্থার সমর্থক ছিলেন এ কথা অনেকেই জানেন। আর্থিক উদারী করণে ও তার বিশ্বাস ছিল বলে মনে হয়না। কিন্তু সহকর্মী বন্ধু ডঃ মনমোহন সিং এর সততার প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। অমর্ত্য সেন, অশোক রুদ্র, ডঃ মনমোহন সিং এরা প্রায় সমসাময়িক অর্থনীতিবিদ। এঁদের মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য থাকলেও তাঁরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ভারতবর্ষের উদার অর্থনীতির প্রবর্তক ডঃ মনমোহন সিং সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। বর্তমান প্রজন্ম ডঃ মনমোহন সিং সম্বন্ধে কতদূর জানে জানিনা। তারা যে সময় বড় হচ্ছে , সেই সময়কার প্রশাসনের ভাষা আলাদা। তারা ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়। কবরস্থান থেকে শ্মশান বলতে তাদের বুক কাঁপে না। বুলডোজার দিয়ে সংখ্যালঘুদের বাসস্থান গুঁড়িয়ে দিয়ে তারা উল্লাস করে। পরিতাপের বিষয় আমাদের বর্তমান প্রজন্ম দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে ভুল শিক্ষা পাচ্ছে।

ডঃ মনমোহন সিং ছিলেন একাধারে ভদ্র নম্র এবং পন্ডিত মানুষ। তার ভদ্রতা এবং নম্রতাকে অনেকে দুর্বলতা বলে ভুল করতেন। তিনি যখন সরকার চালাতেন তখন বিরোধীপক্ষ তাকে নানাভাবে অপমান করার চেষ্টা করেছে। তিনি তার নীতির প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে তার জবাব দিয়েছেন। তার উদারনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কে পর্যালোচনার জায়গা এটা নয় । কিন্তু এটা বাস্তব যে তার অর্থনৈতিক উদারীকরণের ফলে ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে অর্থের সমাগম হয়েছে । পৃথিবীজুড়ে প্রযুক্তিগত যে উন্নতি, তার সুফল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর বর্ষিত হয়েছে। আজকে আমরা সাধারন মানুষ যে Gadgets ব্যবহার করছি, ঘরে ঘরে যে কম্পিউটার, মোবাইল ফোন আরো নানা ধরনের যন্ত্র যা আমাদের জীবন যাত্রাটা অনেক সহজতর করে তুলেছে, তার পিছনে রয়েছে ডঃ মনমোহন সিং-র অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচি ।

অর্থনীতির কৃতি ছাত্র মনমোহনের জন্ম পশ্চিম পাঞ্জাবে। অত্যন্ত সাধারণ ঘর থেকে উঠে এসে তিনি শিক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ পাস করে তিনি কেমব্রিজে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে যান। সেখানেও তিনি তাঁর কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন।

মনমোহন সিংহ প্রথম জীবনে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তখন তাঁর সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন অধ্যাপক অমর্ত্য সেন , অধ্যাপক সুখময় চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের।

১৯৭২ সালে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রান উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দেন। এরপর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর, পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান। ১৯৯১ সালে তিনি নরসিংহ রাও পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই সময় ভারত বিশেষ আর্থিক দুর্বিপাকে পড়ে। বিদেশি মুদ্রার তহবিল প্রায় তলানিতে এসে ঠেকে। রাজস্ব ঘাটতিও এই সময় খুব বেশি ছিল এবং balance of payment খাতেও ঘাটতি প্রকট ছিল। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি পায়। ফলে ভারতের অর্থনীতি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। পশ্চিম এশিয়া থেকে কর্মরত শ্রমিকেরা বিপুল পরিমাণ অর্থ ভারতে পাঠাতো ।এই অর্থ ভারতের বিদেশি মুদ্রা অর্জনের অন্যতম উপায় ছিল। কিন্তু পশ্চিম এশিয়ায় তেলের দাম বৃদ্ধি পাবার ফলে, বিদেশ থেকে পাঠানো মুদ্রার পরিমাণ ব্যাপক পরিমাণে হ্রাস পায়। এর পরিণামে বিদেশি মুদ্রা ভান্ডারে বিপুল পরিমাণ ঘাটতি দেখা যায়। মাত্র দু সপ্তাহ আমদানি মেটানোর মত মুদ্রা, মুদ্রা ভান্ডারে অবশিষ্ট থাকে। পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রী ,অর্থমন্ত্রীর পরামর্শে অর্থনৈতিক উদারীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ভারতের অর্থনীতি সংক্রান্ত যে বিধিনিষেধ ছিল তার ব্যাপক সংস্কার করা হয়।। রাজস্ব খাতে ব্যাপক ঘাটতির কথা বলা হয়েছে। ভারতের মোট জিডিপির আট শতাংশে নেমে আসে রাজস্ব ঘাটতি এবং মোট উৎপাদনের দুই শতাংশে নেমে আসে চলতি খাতে (current account) ঘাটতি। জিনিসপত্রের মূল্য এরই পাশাপাশি ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। তখন দেশের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং।প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও।

অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে নরসিংহ রাও সরকার, অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সহায়তায় দুধাপে টাকার অবমূল্যায়ন করেন।

আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডারের কাছ থেকেও ঋণ গ্রহণ করা হয়। অর্থ ভান্ডারের চুক্তি অনুসারে ভারতে মজুদ সোনা বিদেশি ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখতে হয়। এছাড়াও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। রপ্তানির উপর থেকে ভর্তুকি তুলে নেওয়া হয়। লাইসেন্স রাজ প্রথার সংস্কার করা হয়। ১৮ টি শিল্প বাদে, অন্য সকল শিল্পর উপর থেকে বিধিনিষেধ শিথিল করে দেওয়া হয়। প্রবল বিরোধিতার মুখে নরসিংহ রাও সরকার মনমোহন সিংয়ের প্রাজ্ঞতা এবং সততার উপর ভিত্তি করে এই সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করে। এই সংস্কারের ফলে ভারত আর্থিক সঙ্কট থেকে অনেকাংশে মুক্তি পায়। ভারতে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। শিল্প প্রসারিত হয়। অর্থনীতি ক্রমশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এই আর্থিক উদারীকরণ নীতির কিছু নেতিবাচক দিকও সমালোচকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। মুক্তদ্বার নীতি গ্রহণের ফলে ভারতের বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে, জিডিপির হারেরও প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু তার সুফল সমভাবে বন্টিত হয়নি।। তার ফলে দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মনমোহন সিংহ ভারতের উদারনৈতিক অর্থনীতির জনক। ২০০৪ সালে কংগ্রেস লোকসভা ভোটে জয়ী হলে মনমোহন সিংকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার কাজ অবশ্য স্মরণীয়। তিনি দেশের অর্থনীতির দরজা পৃথিবীর কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু দেশের দরিদ্র জনগণের জন্য তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু জনকল্যাণ মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য বিশেষ করে গ্রামে বসবাসকারী শ্রমিকদের একশ দিনের কাজ প্রকল্পটি গ্রহণ করেন। এই প্রকল্পর মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র মানুষের অকির সম্পর্কে তিনি তাদের সচেতন করে দেন। গরিব মানুষকে কাজ দেওয়ার জন্য যে সরকার দায়বদ্ধ এই ধারণাটা তিনি তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই এই প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব আজ আমরা অনুভব করতে পারছি। কোভিড মহামারীর সময় যখন দূর-দূরান্তে থেকে গরিব মানুষেরা কাজ হারিয়ে গ্রামে ফিরে এলো, তখন তাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল এই '১০০ দিনের কাজ' প্রকল্পটি। যার পুরো নাম 'মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন।'

মনমোহন সিংহ সরকার ২০০৫ সালে তথ্যের অধিকার আইন পাস করে। এই আইনের মাধ্যমে একজন ভারতীয় নাগরিক কোন সরকারি সংস্থা অথবা সরকার নিয়ন্ত্রণীন কোন সংস্থার কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করতে পারে। সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেই তথ্যের যোগান দিতে দায়বদ্ধ এই আইন অনুযায়ী। এই আইনটি প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে ভারতের মতো বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত আরো পোক্ত হয়ে ওঠে। নাগরিকদের উপর অধিকার বর্তায় সরকার কী ধরনের কাজ করছে, সে সম্পর্কে জানার।

মনমোহন সিং ১৯৯১ সালে যে অর্থনৈতিক সংস্কার করেন, তার সুফল পরিলক্ষিত হয় একবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে। ২০০৪ সাল থেকে ২০১৪ সাল অবধি বার্ষিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৫ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ। এর মধ্যে ২০০৭-২০০৮ সালে পৃথিবীব্যাপী মন্দার কারণে অর্থনীতির বৃদ্ধির হার কমে যায়। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুসারে ২০১৬ সাল অব্দি ভারতে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৬ শতাংশর নিচে নামেনি। ২০১৪ সালের নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসেন। ২০১৬ সালে তিনি বিমুদ্রাকরণ বা demonetisation করেন। তার এই পদক্ষেপ ভারতের অর্থনীতির পক্ষে সুখকর হয়নি। অনেক প্রথিত যশা অর্থনীতিবিদ, অমর্ত্য সেন , কৌশিক বসু প্রমুখ এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেন। ২০১৬ সালে পর থেকে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার কমতে শুরু করে। ২০২০ সালে কোভিড মহামারী সময় ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। প্রবৃদ্ধির হার ৩.১ শতাংশে নেমে আসে।

২০০৪ সালের পর থেকে মনমোহন সিংয়ের আমলে প্রাইভেট সেক্টরে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। দেশের স্থির মূলধন মোট জাতীয় উৎপাদনের ২৪ শতাংশে এসে পৌঁছয়।। এই হার বজায় থাকে ২০১২ সাল অবধি। মনমোহন সিংয়ের প্রথম পাঁচ বছর অর্থাৎ ২০০৪ থেকে ২০০৯ দ্বিতীয় ৫ বছরের থেকে অনেক বেশি গৌরবময়। এই পাঁচ বছরে মনমোহন

সিং এর সরকার কে বামপন্থীরা সমর্থন করে। বামপন্থীদের সাথে পরামর্শক্রমেই বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এই সময় ভারত সরকার গ্রহণ করে।। কিন্তু ২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক পরমাণু চুক্তির কারণে বামপন্থীরা সরকার থেকে সমর্থন তুলে নেয়। এর পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ২০০৯ থেকে ২০১৪ মনমোহন সিংয়ের সরকারে বিচ্যুতি দেখা দেয়। টুজি কেলেঙ্কারি সহ আরো কিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। মুদ্রাস্ফীতি ঘটে এবং দারিদ্র বৃদ্ধি পায়।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসেন এবং ঝুড়ি ঝুড়ি প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তার প্রতিশ্রুতি গুলি তিনি বাস্তবে রূপায়িত করতে ব্যর্থ হন। যেমন তিনি বলেছিলেন যে বিদেশ থেকে কালো মুদ্রা সংগ্রহ করে এনে ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের ব্যাংক একাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে জমা দেবেন। কিন্তু তার কোন প্রতিফলন বাস্তবে দেখা দেয়নি। তিনি ক্ষমতায় আসার পর তার মূল স্লোগান ছিল 'সব কে সাথ সবকা বিকাশ'। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে বিভাজিত করা হচ্ছে। সংখ্যালঘু মুসলমান খ্রিস্টানদের ক্রমশ এক ঘরে করে দেয়া হচ্ছে। মিথ্যা অভিযোগে গরু পাচারের নামে, গো হত্যার নামে গো মাংস ভক্ষণের নামে সংখ্যালঘুদের হত্যা করা হচ্ছে।

দেশকে ক্রমশ হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। পাঠ্যপুস্তক বিকৃত করে ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তার আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বারবার আক্রান্ত হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিসর ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। চিন্তার স্বাধীনতা ব্যাপ্রাপ্ত হচ্ছে। মনমোহন সিংহের জমানায় শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষার অধিকার কে আইনে পরিণত করা হয়েছিল। শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পায়, মনমোহনের আমলে। নরেন্দ্র মোদির আমলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়।

পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী কোভিডের পরবর্তী সময়েও বেকারত্বের হার কমানো সম্ভব হয়নি। ২০২১ সালের প্রথম তিন মাসে বেকারত্বের হার ছিল ৮.৬ শতাংশ। মহিলাদের ক্ষেত্রে বিগত বছরের থেকে তা বৃদ্ধি পেয়ে বেকারত্বের হার দাঁড়ায় ১১.৮ শতাংশে। কোভিডের পূর্ববর্তী সময়ে employment population ratio ছিল ৪৩ শতাংশ।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুসারে এই হার সমগ্র বিশ্বে ছিল ৫৫ শতাংশ। বাংলাদেশ এবং চীন দেশে এই হার ছিল যথাক্রমে ৫৩ শতাংশ এবং ৬৩ শতাংশ। গ্রামীণ ক্ষেত্রে ১০০ দিনের কাজের চাহিদা ছিল খুব বেশি। একশ দিনের কাজের প্রকল্পটি ছিল গ্রামের মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। নরেন্দ্র মোদির সরকার এই প্রকল্পটি সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিল না। প্রকল্পটি নিয়ে তাদের নেতিবাচক মনোভাব ছিল।

মোদিজীর আমলে এই প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়। গ্রামীণ মানুষকে আর্থিক সাহায্য করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। মনমোহন সিং সরকারের আমলে এই প্রকল্পটি দরিদ্র মানুষকে আর্থিক নিরাপত্তা দান করতে সমর্থ হয়েছিল। ২০০৭ -২০০৮ সালের পৃথিবীব্যাপী মন্দার মোকাবিলা মনমোহন সিংহ সরকার সাফল্যের সাথে করতে পেরেছিল জনকল্যাণ মুখী প্রকল্পের সহায়তায়।

মোদির প্রতি বছর এক কোটি চাকরির কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি employment population ratio আমাদের দেশে বাংলাদেশ এবং চীনের থেকে কম। কৃষকদের আয় তিনি ২০২২ এর মধ্যে দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।। কৃষকদের ক্ষোভ যদি না থাকতো, তাহলে দিল্লিতে এত বড় কৃষক আন্দোলন হতো না। নির্বাচনের প্রাক্কালেও কৃষক আন্দোলন অব্যাহত আছে। ৯০ এর দশকে উদারীকরণের পর থেকে আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে, মোদীজির জামানায় এই বৈষম্য বৃদ্ধির হার আরও বেশি বৃদ্ধি পায়। তার অন্যতম কারণ আমাদের করের কাঠামো। ২০১৬ সালে বিস্তর ঢাকঢোল পিটিয়ে মোদিজি জিএসটি ঘোষণা করেছিলেন। এই জিএসটির তিনের-চার শতাংশ আসে ধনী ১০ শতাংশের কাছ থেকে। দুই তৃতীয়াংশ আসে দরিদ্রতম পঞ্চাশ শতাংশ গরীব মানুষের কাছ থেকে। এক-তৃতীয়াংশ মধ্যবিত্ত ৪০% এর কাছ থেকে।। অর্থাৎ Oxfam এর রিপোর্ট অনুযায়ী, দরিদ্র ৫০% সুখাদ্য এবং অখাদ্যের জন্য তাদের আয়ের ৬.৫% ব্যয় করে, মধ্যবিত্ত ৪০% ব্যয় করে ওই খাদ্য এবং কুখাদ্যের জন্য ৩.৩ শতাংশ,। অন্যদিকে উচ্চবৃত্ত ১০ শতাংশ তাদের আয়ের মাত্র ০.৪ শতাংশ ব্যয় করে ওই খাদ্য এবং কুখাদ্যের জন্য।

২০১৬ সাল থেকে বিজেপি জামানায় সম্পদের উপর থেকে কর তুলে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে আগেই বলা হয়েছে। কোভিদের সময় স্বাস্থ্য বাজেট কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও, বর্তমানে তা নিম্নমুখী। বিজেপি সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য জনমুখী বা কল্যাণকামী প্রকল্প গুলির প্রতি বিমাতৃসুলভ মনোভাব। বিজেপি সরকারের অভিমুখ মুনাফা নির্ভর কর্পোরেট বান্ধব অর্থনীতির প্রতি। এর ফলে দেখা যাচ্ছে যখন কোভিদ মহামারীর সময় দেশের অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়ছে, ঠিক সেই সময় কালে আদানি আম্বানি প্রমুখ পুঁজিপতিদের সম্পদ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সর্বোপরি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মনমোহন সিংয়ের আমলে যে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল, বিজেপি সরকার সেগুলোর প্রতি মোটেই আস্থাভাজন নয়। অথচ কোভিডের সময় আমরা দেখলাম যে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পটির উপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মোদি সরকার নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে।

মনমোহন সিংহের সরকারের প্রথম পাঁচ বছরে আমরা দেখেছি অর্থনীতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্য জানার অধিকার, গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি প্রকল্প, শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন বলবৎ হয়েছে। ইউপিএ সরকারের দ্বিতীয় পর্ব, প্রথম পর্বের মত উৎসাহ ব্যঞ্জক ছিল না। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতা ছিল। প্রশাসনে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু দেশকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের কোন প্রচেষ্টা হয়নি। হিন্দুত্ববাদীদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। কিন্তু হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি গুজরাটে (২০০২-০৩), মুজফফরনগরে (২০১২-১৩) সালে ব্যাপক দাঙ্গা করে এক বিশাল হিন্দু ভোট ব্যাংক তৈরি করে। তথাপি দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো সুরক্ষিত ছিল।

প্রধানমন্ত্রী বা তার পরিবারকে দুর্নীতি স্পর্শ করতে পারেনি। মনমোহন সিংয়ের প্রশাসন পরিচালনার মধ্যে ব্যক্তি মনমোহনের কোন ছায়া পড়তে দেখা যায়নি। তাঁর আমলের যা কিছু সাফল্য তিনি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন। ❐

‘মাহমুদ মন্দির ধ্বংস করেছে, শিয়াদের মসজিদও’ — বললেন রোমিলা থাপার ও তিস্তা শীতলাবাদ

এখন প্রশ্ন উঠবে, কেন ওরা নিজেদের স্থাপনাগুলি বিদ্যমান স্থাপনাগুলির এতটা গা ঘেঁষে তৈরি করেছিল? এটা কি এ-জন্যে যে তাদের মনে হয়েছিল, এগুলো পবিত্র স্থান, সুতরাং আমরা এভাবে এর পবিত্রতাকেও আত্মস্যাৎ করছি? এটা একটা কারণ হতে পারে। আবার এমনটাও হতে পারে, আমরা অনেক বেশি উন্নত ধর্ম, সেজন্যে আমরা এভাবে এর জায়গায় নিজেদের স্থলাভিষিক্ত করছি। এটাও একটা সমভাবে সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। বৌদ্ধধর্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পরবর্তী সময়ে আমরা দেখছি হিন্দুরা এসে বৌদ্ধদের ধর্মস্থানগুলিকে মন্দিরে রূপান্তরিত করতে।

Mahmud destroyed the temple– the mosque of the Shias

মসজিদের তলায় মন্দির ছিল। সেই মন্দির ভেঙেই তৈরি হয়েছে এই মসজিদ। স্বাধীনতার আগে থেকেই এ-ধরনের প্রচারের মাধ্যমে ভাবাবেগ তৈরি করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে চেয়েছে হিন্দুত্ববাদীরা। তখন এই বিবাদগুলি সীমাবদ্ধ থাকত স্থানীয় স্তরেই। স্বাধীনতার দাবিতে ভারতীয় জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে দুর্বল করতে ঔপনিবেশিক শাসকরা কখনও উৎসাহ জুগিয়েছে এ-ধরনের ভাবাবেগ নির্মাণে। কিন্তু এই দাবি কখনোই জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রে আসতে পারেনি। স্বাধীনতার ঠিক পরপর যখন ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় রক্তাক্ত হচ্ছে বিভাজিত ভূখণ্ডের দুটি অংশ, তখন অযোধ্যার বাবরি মসজিদ চত্বরে হঠাৎ করেই রামলালার একটি মূর্তি ‘প্রকট’ হয়। চুপিসারে মূর্তি বসিয়ে দেওয়ার এই তথাকথিত ‘প্রকট’ হওয়ার নীল নক্সাটি বুঝতে পেরে সেটিকে সরিয়ে দেওয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নেহরু। ফৈজাবাদের জেলা শাসক কে. কে. নায়ার রাজ্যের মুখ্য সচিবের এই মর্মে আদেশ কার্যকর করতে অস্বীকার করেন। নায়ার পরে জনসঙ্ঘে যোগদান করেন ও লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। এই বিতর্ক পরবর্তী তিনটি দশকে কখনোই জাতীয় রাজনীতিতে আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠতে পারেনি। বিগত শতকের আটের দশকে পুরোনো জনসঙ্ঘ নতুন চেহারায় বিজেপি হয়ে আবির্ভূত হওয়ার পর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে বাবরি মসজিদ ভেঙে রাম মন্দির গড়ার আন্দোলন শুরু হয় সারা দেশে। সেই থেকেই বিজেপি রাজনীতির মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায় অযোধ্যা, বারানসী ও মথুরায় মসজিদের তলায় মন্দিরের তত্ত্ব। বি. বি. লালের মতো সঙ্ঘ পরিবারের নিজস্ব ‘ইতিহাসবিদ’রা এ-নিয়ে আকাশ কুসুম গল্প ছড়াতে থাকে। এই সময়ে রোমিলা থাপারের মতো আন্তর্জাতিক স্তরে নন্দিত ইতিহাসবিদরা ইতিহাস বিকৃতির এই অপচর্চার বিরুদ্ধে সত্যনিষ্ঠ প্রতিবেদন তুলে ধরেন একের পর এক। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর অযোধ্যা প্রশ্নে ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের বিতর্কিত রায়ে উৎসাহিত হয়ে সঙ্ঘ পরিবারের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে সারা দেশে অসংখ্য মসজিদকে নির্বিচারে মন্দির ভাঙার অভিযোগে অন্তর্ভুক্ত করে নিম্ন আদালতে মামলা দায়ের করা শুরু হয়। মোদী রাজত্বের ভ্রূশাসনে নিম্নস্তরের আদালতগুলি ধর্মস্থান সম্পর্কিত বিদ্যমান ভারতীয় আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সঙ্ঘ পরিবারের মর্জি-মাফিক নির্দেশও দিতে শুরু করে। সরকারি স্তর থেকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের যে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে, তাকে মোকাবিলা করার জন্যে আমাদেরকে ফিরে যেতেই হবে প্রকৃত ইতিহাসের কাছে। ২০১৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি কমিউনেলিজম কমব্যাট পত্রিকার ওয়েব সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল এ-নিয়ে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপারের একটি পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকার। সেই সাক্ষাৎকারে থাপার বলেছিলেন, এটা শুধু ভারতের বিষয় নয়, শুধুমাত্র মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরির বিষয়ও নয়। এমন দৃষ্টান্ত সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে। এমনকী ভারতে মুসলিম শাসকদের আগমনের বহু আগে থেকেই ধর্মীয় স্থাপনা/উপাসনালয় ধ্বংসের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনাগুলি যতটা ধর্মীয় বিদ্বেষজাত, তার চেয়েও অনেক বেশি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক। সম্প্রতি আবারও হিন্দুত্ববাদীরা মসজিদের নীচে মন্দির খোঁজার নামে সারা দেশে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করতে চাইছে। ১৯৯১ সালের উপাসনাস্থল বিষয়ক আইনে বলা আছে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশের যে ধর্মীয় স্থানের যে চরিত্র ছিল, তা বদলানো যাবে না। কিন্তু আরএসএসপন্থীরা এই আইনকে অসাংবিধানিক বলে বাতিল করার দাবি জানিয়ে ছটি মামলা দায়ের করেছে সুপ্রিম কোর্টে। গত ১২ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট জানায় যে মসজিদ, মাজার নিয়ে মামলায় কোনও সমীক্ষার নির্দেশ দেওয়া যাবে না; দেওয়া যাবে না কোনও অন্তর্বর্তী বা চূড়ান্ত রায় এবং সমস্ত আদালতে এ-বিষয় মামলা আপাতত স্থগিত থাকবে। সেই প্রক্ষিতে ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার ও সমাজকর্মী তিস্তা শীতলাবাদের কথাবার্তার একটি অংশ এখানে প্রকাশ করা হল। ;মার্কসবাদী পথ

তিস্তা শীতলাবাদ ধর্মীয় স্থাপনার ধ্বংস নিয়ে নানা ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে। এই অবমাননার অন্তরালের কারণ কী বা এগুলো কি শুধুই হিন্দু-মুসলিম প্রশ্ন ঘিরে; এই সমস্ত নিয়ে আপনার বক্তব্য কী?

রোমিলা থাপার এখানে একটি কথা বলা উচিত। এটা কেউ অস্বীকার করছে না যে ধর্মীয় স্থাপনার ধ্বংস বা অবমাননার কোনও ঘটনাই ঘটেনি। কিন্তু একে যদি ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, তবে একটি প্রশ্ন উঠবে কেন পৃথিবীর প্রতিটি দেশে, প্রতিটি সভ্যতার ক্ষেত্রেই ধর্মীয় স্থাপনার ধ্বংস সাধন বা অবমাননার ঘটনা দেখা গেছে। এর উত্তর হবে, এক, সেখানে একটি ধর্মীয় সংঘাতের ঘটনা বা একটি ধর্মস্থান দখল করার অভিপ্রায় ছিল। দুই, এর মধ্য দিয়ে রাজনৈতিকভাবে কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিষয় ছিল। তিন, এতে অর্থনৈতিক কোনও লাভালাভের বিষয় ছিল। ভারতীয় প্রেক্ষিতে দেখলে এটা অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়। যদি ঝট করে বলে দেওয়া হয় যে, মুসলিমরা এলো আর মন্দির ধ্বংস করে দিল; এটা এমন এক ধরনের স্থূল অতিসরলীকরণ হবে যাতে কর্ণপাত করাটাও অসম্ভব। জটিলতা হচ্ছে এটাই, আমরা যদি অতীতের বৌদ্ধ স্থাপনাগুলির দিকে তাকাই তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ করব। এগুলো সাধারণত মেগালিথিক স্থাপনা বা সমাধিস্থানগুলি ঘেঁষে তৈরি। এমনটা নয় যে প্রত্যেকটিই এমন জায়গায় তৈরি। কিন্তু অনেক জায়গায়ই দেখা গেছে যে সেই স্থাপনাগুলি হয় সমাধিস্থানকে দখল করে তৈরি হয়েছে বা তার লাগোয়া জমিতে নির্মিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠবে, কেন ওরা নিজেদের স্থাপনাগুলি বিদ্যমান স্থাপনাগুলির এতটা গা ঘেঁষে তৈরি করেছিল? এটা কি এ-জন্যে যে তাদের মনে হয়েছিল, এগুলো পবিত্র স্থান, সুতরাং আমরা এভাবে এর পবিত্রতাকেও আত্মস্যাৎ করছি? এটা একটা কারণ হতে পারে। আবার এমনটাও হতে পারে, আমরা অনেক বেশি উন্নত ধর্ম, সেজন্যে আমরা এভাবে এর জায়গায় নিজেদের স্থলাভিষিক্ত করছি। এটাও একটা সমভাবে সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। বৌদ্ধধর্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পরবর্তী সময়ে

আমরা দেখছি হিন্দুরা এসে বৌদ্ধদের ধর্মস্থানগুলিকে মন্দিরে রূপান্তরিত করতে।

তিস্তা শীতলাবাদ শংকরাচার্যদের সময়ে?

রোমিলা থাপার তারও অনেক আগে, অনেক আগেই। তের বা শেয়জার লার মতো জায়গায় চৈত্য নামে পরিচিত বৌদ্ধদের বিশাল সভাঘর, যার একটা দিক স্তূপ ও বৌদ্ধ কারুকার্য দিয়ে সজ্জিত করা হত, ওগুলোকে বিনা বাধায় হিন্দু মন্দিরের মণ্ডপে পরিণত করা হয়। এ-রকম বহু দৃষ্টান্ত খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। আবার খুব উৎকট সংঘাতের ঘটনাও পাওয়া যাবে। আমরা ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি খুঁটিয়ে পড়ি না। সেটা করা খুবই জরুরি। দ্বাদশ শতকে কলহন নামের এক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ কাশ্মীরের ইতিহাস বিষয়ে রাজতরঙ্গিনী নামের বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি সেখানে লিখেছেন কীভাবে কাশ্মীরের শাসকরা গান্ধার অঞ্চলের বৌদ্ধ মঠগুলিকে আক্রমণ করেছিল। গান্ধার হচ্ছে আজকের পাকিস্তান ও আফগানিস্থানের সীমান্ত অঞ্চল। তারা মঠগুলি আক্রমণ করে এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হত্যা করেছিল।

তিস্তা শীতলাবাদ এটা রাজতরঙ্গিনী-তে রয়েছে?

রোমিলা থাপার এটা কলহনের রাজতরঙ্গিনী-তে লিখিত রয়েছে। সময়পর্বটি হচ্ছে হুনদের রাজত্বকাল, মিহিরকুল, তোরামানার সময়ে। তার মানে খ্রিস্টিয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে। ফলে এমনটা যে ঘটে এসেছে সেটা দেখাই যাচ্ছে। হয়তো বিশাল সংখ্যায় নয়, কিন্তু এমন ঘটনা ঘটেছে। এবারে এই প্রশ্নে আসতে হবে, কেন এমনটা হত? তারপর অবশ্যই মুসলিমরা অর্থাৎ তুর্কি, আফগানরা আসে এবং মন্দিরের ধ্বংসও শুরু হয়। তবে যতটা ভাবা হয়, তারা তত বেশি সংখ্যায় ধ্বংস করেনি। সাধারণভাবে বলা হয় যে ৩০০৮টি মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল। কিন্তু রিচার্ড ইটন যিনি মন্দির ধ্বংস সংক্রান্ত প্রতিটি তথ্য নিয়ে নিবিড় গবেষণা করেছেন, তিনি বলেছেন প্রকৃতপক্ষে ৮০টি মন্দিরের ক্ষেত্রেই ধ্বংস করার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

তিস্তা শীতলাবাদ মাত্র ৮০টি?

রোমিলা থাপার হ্যাঁ, মাত্র ৮০টি। অন্য যে তথ্যটি পরিবেশিত হয়ে থাকে সমাজে তার বিপরীতে ইটনের তথ্য অনুযায়ী সংখ্যাটি ৮০। তার চেয়েও মুখ্য প্রশ্নটি হচ্ছে কেন হত এই ঘটনাগুলি? এক্ষেত্রে আবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখা যাবে। যে-মন্দিরগুলো ধ্বংস করা হয়েছিল সেগুলি ছোটো বা ধর্মীয় দিক থেকে খুব গুরুত্ব বহনকারী মন্দির ছিল না। সে-সব ছিল মূলত বিশালাকার মন্দির, প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী। যেগুলি রাজনৈতিক দিক থেকে এবং অর্থনৈতিক মানদণ্ডেও গুরুত্বপূর্ণ। এ-ধরনের মন্দিরকেই নিশানা করা হত। তার মানে তিনটি বিষয় পাওয়া যাচ্ছে। এক, ধর্মীয় দিক। যেমন, আমরা এই ধর্মকে পছন্দ করি না, এরা যে মূর্তিপূজা করে সেটা ইসলাম বিরোধী। সুতরাং আমরা এদের মূর্তি ধ্বংস করব। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক সোমনাথ মন্দিরের ক্ষেত্রেই, মাহমুদ মূর্তি ভেঙেছে, মন্দিরের অবমাননাও করেছে, অথচ যেমনটা ভাবা হয়ে থাকে, সেই অর্থে কিন্তু মন্দির পুরোপুরি ধ্বংস করেনি। যাইহোক, পরে অবশ্য সেটার পুনর্নির্মাণ করা হয়।

তিস্তা শীতলাবাদ মাহমুদ ধ্বংস করার আগেও এই মন্দির আরও কয়েকবার ধ্বংস করা হয়েছিল।

রোমিলা থাপার না, না।

তিস্তা শীতলাবাদ অন্য রাজারা?

রোমিলা থাপার না, না। সুতরাং, একটা হচ্ছে ধর্মীয় দিক। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, যদি সেটা বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী মন্দির হয়, সে ক্ষেত্রে বিষয়টি হচ্ছে লুণ্ঠন। যে যে মন্দিরগুলি ধ্বংস হয়েছিল তার সবকটির ক্ষেত্রেই এটা ছিল একটি প্রধান কারণ। সাধারণভাবে এমন মন্দিরগুলিই বাছা হত যাদের বড়ো খাজাঞ্চিখানা বা ধনভাণ্ডার ছিল। ফলে এখান থেকেই এই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাহমুদের দৃষ্টান্তটি কৌতুহলোদ্দীপক কারণ সে যেমন ধনসম্পদ থাকা মন্দির ধ্বংস করেছে, আবার সে শিয়াদের মসজিদও ধ্বংস করেছে। সে সময়ের ঘটনাপঞ্জীগুলিতে বারবার এ-কথা লেখা আছে যে মাহমুদ পঞ্চাশ হাজার কাফের ও পঞ্চাশ হাজার শিয়াদের হত্যা করেছে। এই সংখ্যাগুলি কতটা বিশ্বাসযোগ্য সেই প্রশ্ন থাকবে এবং এর থেকে বলাই যাবে যে এই বলার মধ্যে একটা ধর্মীয় বিদ্বেষের দিকও রয়েছে। একটা অর্থকরী লাভালাভের বিষয় তো বোঝাই যায়। তৃতীয় আরেকটি দিক আমাদের মনে রাখা উচিত যে, বিপুল ধনসম্পদ থাকা যে মন্দিরগুলি রাজধানী শহরের সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং যেগুলি ছিল শাসকদের আনুকূল্যধন্য, সেগুলি এক অর্থে ক্ষমতারও প্রতীক ছিল। যখনই একজন শাসক প্রকৃত অর্থে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বের অধিকারী হয়, তখনই সে রাজকীয় মন্দির প্রতিষ্ঠা করে এবং ঘোষণা করে দেয় যে সে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সুতরাং মন্দিরের উপর আক্রমণ রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর আক্রমণকেও বোঝাত। এটা শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই ঘটেছে এমনটা নয়। সারা পৃথিবী জুড়েই ঘটেছে। অর্থনৈতিক লাভ, ধর্মীয় বিদ্বেষ এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উপর আক্রমণ, এই তিনটিই হচ্ছে কারণ যার জন্যে ধর্মীয় স্থাপনার উপর আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে সর্বত্র। কলহন আরও কিছু কৌতুহলোদ্দীপক বিবরণ দিয়েছেন যেখানে তিনি বলেছেন, দুশো বছর সময়পর্ব জুড়ে কাশ্মীরে হিন্দু রাজারা হিন্দু মন্দিরগুলিতে আক্রমণ করে সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। বইটি পড়ার সময়ে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে কেন হিন্দু রাজারা হিন্দু মন্দির আক্রমণ করত। তারপর আমরা হর্ষদেব নামে এক বিখ্যাত রাজার রাজত্বকালের উল্লেখ পাব যিনি এবং যার অমাত্যরা শুধু মন্দির লুঠই করেননি, মন্দিরের অবমাননাও করেছেন। তিনি এক বিশেষ ধরনের অমাত্যও নিযুক্ত করছেন যাদের কাজই ছিল দেবদেবীর উৎপাটন করা।

তিস্তা শীতলাবাদ সেটাই কাজ?

রোমিলা থাপার সেটাই কাজ। বলা হত 'দেবোৎপাটন-নায়ক'। এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়, এখানে তো ধর্মীয় বিদ্বেষের বিষয় নেই। নিখাদ লুণ্ঠন। কলহন সেটাই বলেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর চিত্তাকর্ষক বিশ্লেষণটি হচ্ছে যে, তখন একটি অর্থনৈতিক সংকট চলছিল। ফলে যে স্থান থেকে সহজে এবং দ্রুত বিপুল অর্থসম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল সেটা ছিল একমাত্র মন্দির লুণ্ঠন। ফলে আমার বক্তব্য হল, আমরা এ-ধরনের ঘটনাবলীর জন্যে একটিমাত্র কারণকে চিহ্নিত করে একে ব্যাখ্যা দিতে ব্যগ্র হলে চলবে না। এটা একটা জটিল বিষয়। এতে অনেক বিষয় সংশ্লিষ্ট রয়েছে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণের সম্পর্ক রয়েছে। এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে যারা হিন্দু নয় তারা মন্দির রক্ষা করছে বা সংরক্ষণ করছে, আবার হিন্দুরা মসজিদ রক্ষা করছে ইত্যাদি। এটা ভীষণভাবে স্থানীয় স্তরের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি বা স্থানীয় স্তরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বা স্থানীয় স্তরে ধর্মীয় অনুভূতি তার সাথে সম্পর্কিত। ❐

..... অনুবাদ- শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার

বিচারপতির বিদঘুটে বিচার

মজিবুর রহমান

.....

ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান তিনটি অংশ হল আইন বিভাগ (লেজিসলেচার), নির্বাহী বিভাগ (এক্সিকিউটিভ) ও বিচার বিভাগ (জুডিশিয়ারি)। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তথা জনপ্রতিনিধি হিসেবে সাংসদ ও বিধায়করা আইন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁদের নিয়েই সরকার গঠিত হয়। তাঁরাই আইন রচনা করেন। দেশের সর্বোচ্চ আইন তথা সংবিধানের বিভিন্ন বিধি নিয়ে কাটাছেঁড়া করার অধিকারও রয়েছে তাঁদের। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের সরকারি কর্মচারী তথা আমলা ও আধিকারিকদের নিয়ে নির্বাহী বিভাগ গঠিত। সরকারের সিদ্ধান্ত সমূহ কার্যকর করার দায়িত্ব নির্বাহী বিভাগের। নির্বাহী বিভাগ প্রাত্যহিক প্রশাসন (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) পরিচালনা করে। আইন বিভাগ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে গঠিত হলেও নির্বাহী বিভাগের লোকদের অরাজনৈতিক হতে হয়। আইন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের বিচ্যুতির বিচার করার দায়িত্ব বিচার বিভাগের। সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগ জানানোর জায়গা বিচার বিভাগের অন্যতম প্রতিষ্ঠান আদালত। ন্যায় প্রতিষ্ঠা তথা অন্যায়ের প্রতিকার করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আদালতের। বিচার বিভাগ নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করে। বিচার বিভাগ সরকার ও প্রশাসনের প্রভাবমুক্ত একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী স্তম্ভ। দেশবাসীর অন্তিম ভরসার স্থল।

ভারতের বিচার বিভাগের কাঠামো অনেকটা পিরামিডের মতো। কাঠামোর নিম্নতম স্তরে রয়েছে মহকুমা আদালত। তার উপরে জেলা আদালত। রাজ্য স্তরে হাইকোর্ট এবং একদম শীর্ষে জাতীয় স্তরে দেশের রাজধানী নয়াদিল্লিতে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট বিচার বিভাগে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। সুপ্রিম কোর্ট দেশের সমগ্র বিচার বিভাগকে পরিচালনা করে। দেশের ২৫টি উচ্চ আদালত, প্রায় ৮ শত জেলা আদালত এবং কয়েক হাজার মহকুমা আদালত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন আইনকে বাতিল ঘোষণা করার অধিকার ভোগ করে। এজন্য সুপ্রিম কোর্টকে সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে অভিহিত করা হয়। আইনি পেশায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হওয়া সবচেয়ে সম্মানজনক ব্যাপার। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদের থেকে বেশি মর্যাদাকর হল সুপ্রিম কোর্টের একজন সাধারণ বিচারপতি হওয়া। এজন্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মনোনীত হওয়ার আগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে কোনো হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়।

ভারতের সুপ্রিম কোর্টে ৩৪ জন বিচারপতি রয়েছেন। রীতি অনুযায়ী, তাঁদের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তিটি চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া (সি জে আই) বা ভারতের প্রধান বিচারপতি মনোনীত হন। উল্লেখ্য, সিনিয়রিটি জন্ম তারিখ অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয় না। জ্যেষ্ঠতা পরিমাপ করা হয় সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে নিয়োগের তারিখের উপর ভিত্তি করে। দু'চারটা ব্যতিক্রম ছাড়া সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতিদের কার্যকালের মেয়াদ সাধারণত ৫ থেকে ৭ বছরের বেশি হয় না। ১৯৫০ সালে সংবিধান প্রবর্তনের পর থেকে এখনও পর্যন্ত সি জে আই নিযুক্ত হয়েছেন ৫১ জন। অর্থাৎ ভারতের প্রধান বিচারপতিদের কার্যকালের মেয়াদ গড়ে দেড় বছর।

ভারতীয় বিচার বিভাগের একটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম হল ধনঞ্জয় যশবন্ত চন্দ্রচূড়। তিনি ৫০তম সি জে আই হিসেবে ১০.১১.২৪ তারিখ তাঁর কার্যকাল শেষ করেছেন। তিনি বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন ২০০০ সালের মার্চ মাসে। এরপর দেশের বৃহত্তম হাইকোর্ট এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন ২০১৩ সালের অক্টোবরে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন ২০১৬ সালের মে মাসে। সি জে আই হিসেবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন ২০২২ সালের ৯ই নভেম্বর। সাড়ে আট বছর সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি হিসেবে কাটিয়েছেন, এর মধ্যে দু'বছর সি জে আই। তিনি যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান।তাঁর পিতা যশবন্ত বিষ্ণু চন্দ্রচূড় ছিলেন ১৬তম সি জে আই। তিনি ২৮শে আগস্ট, ১৯৭২-এ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন ২২.২.১৯৭৮ তারিখ এবং অবসর গ্রহণ করেন ১১.৭.১৯৮৫ তারিখ। তাঁর আগে অথবা পরে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ও প্রধান বিচারপতি হিসেবে এমন দীর্ঘ মেয়াদে আর কাউকে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়নি।

সি জে আই ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা ভারতের বিচার বিভাগের শীর্ষে অবস্থান করেন কিন্তু তাঁরা কখনও ক্ষমতার দম্ভ করেন না। তাঁরা কখনও 'পাবলিক ফিগার' হতে চেষ্টা করেন না এবং প্রচারের আলো এড়িয়ে চলেন। সাধারণত নানাবিধ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিষয়ে মতামত প্রদানে বিরত থাকেন। আদালত কক্ষের ভেতরেই তাঁদের কর্মপরিধি সীমাবদ্ধ থাকে। প্রটোকল রক্ষার বাইরে তাঁরা দেশের আইন বা নির্বাহী বিভাগের শীর্ষ পদাধিকারীদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ বা সংশ্রব রাখেন না।ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় ভারতীয় বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ পদাধিকারীদের এই সুপরিচিত ও সযত্নে লালিত যাপন প্রণালীকে অনুসরণ করতে অনাগ্রহণ দেখিয়েছেন। প্রথা ভাঙ্গার খেলায় তিনি মত্ত হয়ে উঠেছেন। আত্মপ্রচারে যত্নবান হয়েছেন। ভীষণ ভাবে চেয়েছেন সবাই তাঁকে চিনুক জানুক। তাই সি জে আই হয়ে তিনি অজস্রবার সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। বিভিন্ন আলোচনা সভা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। রীতি ভেঙে কর্মস্থলের বাইরে জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে ব্যগ্রতা দেখিয়েছেন।

সি জে আই থাকাকালীন ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা দূর করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ করেননি। 'তারিখ পে তারিখ'-এর ট্রাডিশন সমানে চলেছে। এজন্য তাঁর দুই বছরে সুপ্রিম কোর্টে পেন্ডিং কেসের সংখ্যা বেড়েছে বৈ কমেনি। মামলার শুনানি ও রায় প্রদানে দু'একটি বিরক্তিকর বিলম্বের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীদের পঞ্চম বেতন কমিশন সংক্রান্ত মহার্ঘ ভাতা মামলাটি ২০১৬ সালে স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল বা স্যাট-এ শুরু হয়। ২০১৯ সালের জুলাই মাসে স্যাট সরকারকে ডি এ মেটানোর নির্দেশ দেয়। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে হাইকোর্টের একক বেঞ্চ স্যাটের নির্দেশ বহাল রাখে। ২০২২ সালের মে মাসে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ তিন মাসের মধ্যে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলে।ওই বছরের সেপ্টেম্বরে হাইকোর্ট রায়

পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ করে দেয়। এরপর সরকার সুপ্রিম কোর্টে যায়। মামলাটি ২৮.১১.২২ তারিখ সুপ্রিম কোর্টে প্রথমবারের মতো ওঠে। তারপর থেকে দুই বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আজও মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। কয়েক লক্ষ সরকারি কর্মচারীর আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এত বড় মামলা এতদিন ফেলে রাখা হল, চন্দ্রচূড় মহাশয় কোনো সুরাহা করলেন না। পশ্চিমবঙ্গের ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল মামলাটি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আসে ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে। চন্দ্রচূড় মহাশয় নিজের এজলাসেই মামলাটি রাখেন। অবসরের আগে ৬ মাসের বেশি সময় পেলেও মামলাটির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেনি।

সি জে আই ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পিজিটি চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের মামলা গ্রহণ করেন। সংবাদমাধ্যম তাঁর কাছ থেকে শিরোনাম করার উপযোগী কিছু মন্তব্য উপহার পায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই! অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে আর জি কর কাণ্ডের আন্তর্জাতিক আবেগ ও উদ্বেগকে তিনি কার্যত হিমঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সুয়োমোটো মামলা গ্রহণ করার উদ্দেশ্য নিয়েই এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করা অথবা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতায় উস্কানি দেওয়া আমাদের দেশের একটি বড় সমস্যা। বেশকিছু রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এই অপকর্মটি করে চলেছে যা দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে আঘাত লাগলে তা নিশ্চিতভাবেই দেশের ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতির গুরুতর ক্ষতি করে। অনেক এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। অশান্তি সৃষ্টি হয়। দাঙ্গা লাগে। এজন্য শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ধর্মকে ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখার আহ্বান জানায়। ধর্ম ও ধর্মস্থান নিয়ে যেকোনো বিবাদ ও বিতর্ককে অঙ্কুরেই বিনাশ করার কথা বলে। এব্যাপারে বিচার বিভাগের ভূমিকা সর্বাধিক। বিচার বিভাগ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথে সাধ্যমত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, এটাই প্রত্যাশিত। এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটিতে বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের ভূমিকা একেবারে জঘন্য।

২০১৯ সালের নভেম্বরে বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি মামলার রায়ে কোনো বিচারপতির স্বাক্ষর ছিল না। এটা অত্যন্ত অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ব্যাপার। অনেকেই মনে করেন, ওই রায় রচনায় সি জে আই রঞ্জন গগৈর নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চের অন্যতম সদস্য ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় প্রধান ভূমিকা পালন করেন। ওই রায়ে ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর তথাকথিত করসেবকদের হাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির এবং অযোধ্যার অন্যত্র মসজিদ নির্মাণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এতে সংখ্যাগুরুর আধিপত্যবাদ ও হিংসাত্মক কাজকেই কার্যত পুরস্কৃত করা হয়। রাজনৈতিক হিন্দুত্বের জয় হয়। গগৈ-চন্দ্রচূড়রা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হন এবং হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সমর্থক ও মদদদাতা হয়ে ওঠেন। অবসরের প্রাক্কালে চন্দ্রচূড় জানিয়েছেন, তিনি ঈশ্বরের ইশারায় অযোধ্যা সমস্যার 'সমাধান' করেছেন! একজন শিক্ষিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অশিক্ষিত অতি সাধারণ মানুষের মতো কথা বলার এর চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে! যুক্তির জায়গায় ভক্তি আর সংবিধানের স্থানে 'স্রষ্টা'কে এনে ফেললে তো মহা মুশকিল!

অযোধ্যা বিতর্কের আবহে মন্দির-মজসিদ নিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি রোধ করার লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে ধর্মস্থান আইন রচনা করা হয়। অযোধ্যার ধর্মস্থানকে অবশ্য এই আইনের আওতায় রাখা হয়নি। ধর্মস্থান আইন, ১৯৯১-এ অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলা হয় যে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের দিন অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট বিদ্যমান ধর্মস্থানের চরিত্র বদল করা যাবে না। অর্থাৎ, কোনো মসজিদের জায়গায় অতীতে মন্দির অথবা মন্দিরের নীচে মঠ থাকার দাবি আদালতে গ্রাহ্য হবে না। আইনটিতে ধর্মস্থানের আন্তঃসাম্প্রদায়িক চরিত্রের পরিবর্তনও নিষিদ্ধ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি মুসলিম গোষ্ঠীর দরগার স্থানে অতীতে মসজিদ থাকার দাবি জানাতে পারবে না অপর কোনো মুসলিম গোষ্ঠী। ওই আইনে দেশের বিভিন্ন আদালতে চলতে থাকা সমস্ত ধর্মস্থান মামলাকে বাতিল ঘোষণা করা হয়। তিন দশক দেশের কোথাও উপাসনাস্থল নিয়ে মামলা হতে দেখা যায়নি। কিন্তু ২০১৯-এর অযোধ্যা রায়ের পর থেকে বেশকিছু মসজিদের জায়গায় অতীতে বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির থাকার দাবি জানিয়ে আদালতে মামলা দায়ের করা হতে থাকে। ১৯৯১ সালের ধর্মস্থান আইন অনুযায়ী কোনো আদালতেরই এই মামলাগুলো গ্রহণ করার কথা নয়। অথচ মামলাগুলো গ্রহণ করা হতে থাকলো এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে সন্দেহজনক দ্রুততার সঙ্গে সমীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হল। বিষয়টির প্রতি সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে ২০২২ সালের মে মাসে ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় ধর্মস্থান নিয়ে সমীক্ষার নির্দেশকে সমর্থন করেন। এরফলে নতুন করে ধর্মস্থান বিতর্কের 'ফ্লাডগেট' খুলে যায়। এমনকি ১৯৯১ সালের ধর্মস্থান আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা হয়। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি, মন্দির-মসজিদ বিতর্ক ও হিন্দু-মুসলিম বিবাদ বৃদ্ধিতে চন্দ্রচূড়ের অবদান ভুলবার নয়! তবে ভালো খবর হল, নতুন সি জে আই সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ ১২.১২.২৪ তারিখ অন্তর্বর্তী নির্দেশে দেশের বিভিন্ন আদালতে নতুন ধর্মস্থান মামলা গ্রহণ ও সমীক্ষা চালানোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

ভারত সাংবিধানিকভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এর অর্থ হল রাষ্ট্রের নিজস্ব কোনো ধর্ম নেই এবং এজন্য রাষ্ট্রের প্রধান তিন বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে অথবা আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে ধর্মানুষ্ঠান করা থেকে বিরত থাকবেন। কিন্তু যে সুপ্রিম কোর্টের উপর সংবিধান রক্ষার প্রধান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তার শীর্ষ পদাধিকারী হয়েও ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় তাঁর ধর্ম পালনের অনুষ্ঠানকে ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। তিনি তাঁর বাড়ির গনেশ পুজোতে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে হাজির করেন। একেই বলে, রতনে রতন চেনে। প্রধান বিচারপতির বাড়ির ধর্মানুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত, এমন কাণ্ড নজিরবিহীন। সেই সঙ্গে অপ্রত্যাশিত, অনভিপ্রেত ও অবাঞ্ছিত।

স্বাধীন ভারতের বিচার বিভাগের ইতিহাস ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়কে মনে রাখবে। ইতিবাচক কারণে নয়, নেতিবাচক কারণে। বিচক্ষণতার জন্য নয়, বদমাইশির জন্য। তাঁর মতো প্রথা ভঙ্গকারী, প্রচারলোভী, বাক্যবাগীশ, অভিসন্ধি নিয়ে আইন ও সংবিধানের বিকৃত ব্যাখ্যাকারী বিচারপতি বিগত সাড়ে সাত দশকে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আর কেউ আসেননি। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে 'ব্যাড'-এর সুপারলেটিভ ফর্ম তাঁর কখনও হাতছাড়া হবে বলে মনে হয় না। ❐

----- লেখক মুর্শিদাবাদের কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

শতবর্ষে পদার্পণ করল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

.....

গত ২৬ ডিসেম্বর ছিল ভারতে কমিউনিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির শততম জন্মদিবস। ১৯২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর কানপুর শহরে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠকদের সভা থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। সামনের বছর অর্থাৎ ১৯২৬ সালে দেশের মাটিতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের শতবর্ষ উদযাপিত হবে।

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রুশ দেশে নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়। জারের সামন্ততান্ত্রিক শাসনের অবসান হয় ও প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রমিক শ্রেণীর রাজ। ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের ওপর রুশ বিপ্লবের প্রভাব পড়ে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় সম্পৃক্ত হয়ে পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। বোম্বে থেকে এস.এ.ডাঙ্গে সম্পাদিত 'সোশ্যালিস্ট', এম এন রায় সম্পাদিত 'ভ্যানগার্ড', চেন্নাই থেকে সিঙ্গারাভেলু চেটিয়ার সম্পাদিত 'দি লেবার গেজেট', কলকাতা থেকে মুজফফর আহমেদ সম্পাদিত 'লাঙল' প্রভৃতি পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয় এস.এ.ডাঙ্গের বিখ্যাত পুস্তক 'গান্ধি ভার্সেস লেনিন'।

১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে কানপুরে কমিউনিস্টদের প্রথম সম্মেলন যখন অনুষ্ঠিত হয়, ঠিক ওই সময়ে কানপুরে চলছিল কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় অধিবেশন। মনে হয় কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিয়ে তারপর কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে যোগ দেন। কমিউনিস্টদের এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কমরেড সত্য ভক্ত।

অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর তারিখটিকেই পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস বলে মনে করেছিল। ১৯৬৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টি দুই ভাগ হয়। সিপিআই (এম) দলের জন্ম হয়। এই দল বলতে শুরু করে ১৯২৫ নয়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর তাসখণ্ডে। ১৯২০ সালে তাসখণ্ডে এম এন রায় , প্রবাসী কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবী ও কয়েকজন খিলাফতি কৃষক প্রতিনিধি একত্র হয়ে একটি কমিউনিস্ট গ্রুপ গঠন করেন। সেটিকেই ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের বছর বলে সিপিআই (এম) বলতে থাকে। যদিও এই তারিখকে স্বয়ং মানবেন্দ্র নাথ রায় ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের তারিখ বলে মনে করেননি।

ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি কঠোর কঠিন ও গোপন অবস্থার মধ্যে গড়ে উঠেছিল, একথাটা মনে রাখতে হবে। ১৯২২ সালে কমিউনিস্ট নেতা শওকত উসমানি ও আরও আটজনকে গ্রেপ্তার করে তাঁদের বিরুদ্ধে পেশোয়ার কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। এর দুবছর পর ১৯২৪ সালের ২২ মার্চ এম.এন.রায়, এস.এ.ডাঙ্গে, মুজফ্ফর আহমেদ, এস.ভি.ঘাটে, নলিনি গুপ্ত, শওকত উসমানি প্রমুখ বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে শুরু হয় কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা। অভিযোগ হচ্ছে এই কমিউনিস্টরা আইন অনুযায়ী স্থাপিত রাজকীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে উচ্ছেদের জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা করছে।

এর পর ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে সারা দেশের ৩২ জন কমিউনিস্ট শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীকে গ্রেপ্তার করে মীরাট জেলে কারারুদ্ধ করে, শুরু হয় মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা। অর্থাৎ ৭ বছরের মধ্যে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। মীরাট কমিউনিস্ট বন্দীদের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য এই সময় পন্ডিত জওহরলাল পিতা মতিলাল নেহেরুকে সভাপতি করে গঠন করেন 'মীরাট ডিফেন্স কমিটি'। মহাত্মা গান্ধি মীরাট জেলে এসে কমিউনিস্ট বন্দীদের সঙ্গে দেখা করেন ও সংহতি জানান। সারা দেশ জুড়ে কমিউনিস্টদের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও সমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মনে রাখতে হবে ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমিউনিস্ট নেতা মৌলানা হসরৎ মোহানি, তাঁকে সমর্থন করেন আরেকজন কমিউনিস্ট নেতা সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার। এর পর থেকে প্রত্যেক কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁরা পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করতেন। ১৯২৯ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী গুপ্ত বিপ্লববাদী সংগঠন যুগান্তর দল, অনুশীলন সমিতি, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স, উত্তর ভারত ও পাঞ্জাবের বিপ্লবী সংগঠন গদর পার্টি, নওজোয়ান ভারত সভা, হিন্দুস্থান স্যোসালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের (HSRA) বিপ্লবীদের বিরাট অংশ পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এঁদের সংখ্যা হবে কয়েক হাজার।সেই বিশাল নামের তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে শুধু এটা বলা দরকার বিভিন্ন রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টি যাঁরা গড়ে তোলেন ও সর্বভারতীয় নেতৃত্ব তাঁরা প্রত্যেকেই বছরের পর বছর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের জেলে কারারুদ্ধ থেকেছেন।

আগস্ট আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা নিয়ে অতীতে বহু মিথ্যা কুৎসা রটনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে ১৯৪৪ সালের মে মাসে মহাত্মা গান্ধি আগাখাঁ ফোর্ট কারাবাস থেকে মুক্তি পেলে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পুরণ চাঁদ যোশির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ্য পত্র বিনিময় হয়। তাঁদের মধ্যে ১৪ টি চিঠি আদান-প্রদান হয়। গান্ধিজিকে কমঃ যোশি বিস্তৃতভাবে পার্টির কর্মসূচি সম্পর্কে জানান। গান্ধিজি যোশির কাছে যে সকল বিষয়ে জানতে চান তিনি তারও উত্তর দেন। গান্ধিজি ১১ জুন ১৯৪৪ এ যোশিকে চিঠি দিয়ে কয়েকটি বিষয়ে জানতে চান। ১৪ জুন যোশি তার এই চিঠির দীঘ উত্তর দেন।

১৪ জুন,১৯৪৪ এর চিঠিতে যোশি গান্ধিজিকে লেখেন ''গত দু-বছরের মধ্যে আমাদের চারজন কমরেডের ফাঁসি হয়েছে। ('পিপলস ওয়ার', প্রথম খন্ড, ৪০ সংখ্যাতে আপনি তাঁদের কাহিনী পড়তে পারেন)। প্রায় চারশো জন এখনও জেলে। একশো জন কমরেড যাবজ্জীবন কারাদন্ড ভোগ করছে। এই ভাবেই কি সরকার আমাদের সাহায্য করছে? "১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ এর চিঠিতে যোশি গান্ধিজিকে লেখেন ''নয়াদিল্লির দলিল দস্তাবেজ যেদিন জাতির নিয়ন্ত্রণে আসবে, সেদিন দেখা যাবে যে আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক কর্মসূচি সম্বন্ধে সরকারের মতটা কি। কিন্তু আমি শুধু সেদিনের জন্য অপেক্ষা করে থাকছি না''। ওই চিঠিতেই যোশি লেখেন ''সম্প্রতি কাগজের বরাদ্দ সম্বন্ধে যে কঠোর নিয়ন্ত্রণ চাপানো হয়েছে, অধিকাংশ সংবাদ পত্রই তা থেকে কিছু কিছু রেহাই পেয়েছে। আমরাও সরকারের কাছে

দরখাস্ত করেছিলাম। আমি আপনাকে কয়েকটি চিঠির নকল পাঠাচ্ছি; তা থেকে বুঝবেন যে অধিকাংশ 'জাতীয়তাবাদী' সংবাদপত্র ও প্রকাশক যে সুবিধা পেয়েছে, সরকার আমাদের পত্রিকা ও প্রকাশ বিভাগকে তা দেয়নি।

ওই ১২ সেপ্টেম্বরে চিঠিতেই কমঃ যোশি গান্ধিজিকে লেখেন ''সাধারণ অবস্থায় আমাদের পার্টির সুনামের দিক থেকে যা অগ্রাহ্য, সেই ধরনের একটি প্রস্তাব আপনার কাছে করব, শ্রীমতি সরোজিনি নাইডু, রাজাজি (চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী) বা ভুলাভাই দেশাইয়ের মত যে কোন খ্যাতনামা দেশভক্ত আমাদের উভয়ের কাছে বিশ্বাসযোগ্য। তাঁদের কাছে আপনাকে পাঠানো কমিউনিস্ট বিরোধী কাগজপত্র দিন। এই তিনজন আপনার পুরানো সহকর্মী, ওই কাগজপত্রের একটা নকল আমাকে দেবেন। আর তাঁরা যেন যে কোন বিষয়ে আমার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁদের রিপোর্ট পড়ে আপনি ঐ কমিউনিস্ট বিরোধী দলিল-দস্তাবেজে আগুন ধরিয়ে দেবেন''।

চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি যোশিকে বলেন 'আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে রাজী হয়ে তুমি নিজেকে অপমান করেছ'। যোশি তাঁকে বলেন-'আমার দলগত অহংকার কম, আর আমাদের জাতীয় আন্দোলনে যাঁরা বয়োজেষ্ঠ্য, তাঁদের কাছে বিচার চাইতে অসম্মান নেই, বরং সম্মানই আছে'। শ্রীমতি সরোজিনি নাইডু কমিউনিস্ট বিরোধী চিঠিপত্রগুলি পড়ে বলেছিলেন —'অভিযোগগুলি আজগুবি', একথা তিনি প্রকাশ্যেও বলেন। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বলেন— ''কমিউনিস্ট বিরোধী কাগজপত্র হারিয়ে গিয়েছে বলে তার জন্য তল্লাশি চলছে। তিনি দীর্ঘ ১১ মাস অপেক্ষা করেছেন, তাঁর কাছে কিছুই পৌঁছোয়নি। কিন্তু সে প্রতীক্ষা বৃথাই করেছি''।

অরুনা আসফ আলি আগস্ট আন্দোলনের অগ্নিকন্যা ও নেত্রী, জাতীয় নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হয়ে যাবার পর আত্মগোপন করে আগস্ট আন্দোলন পরিচালনা করেন। শত চেষ্টা করেও ব্রিটিশরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন আজমগড়ে আগস্ট আন্দোলনের নেতা সরযু পান্ডে। এক্ষেত্রে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীও ব্রিটিশ এজেন্ট হিন্দু মহাসভা ও আর.এস.এস-এ যোগ দেয়নি।নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের নারী সেনাদের ঝাঁসির রাণী ব্রিগেডের যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন সেই লক্ষি স্বামীনাথন (সায়গল) মুক্তির পর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

গান্ধিজি কমিউনিস্ট পার্টির জনযুদ্ধের তত্ত্বের সঙ্গে একমত হননি। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির আয়-ব্যায়ের হিসাবপত্র দেখে গান্ধিজি বলেন তোমাদের জবাব সম্পূর্ন সন্তোষজনক। অন্যান্য প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি লেখেন- ''তোমার জবাব আমি বুঝেছি, তাঁর বেশ কদরও আমি করি। আমার যদি কোনও কুসংস্কার না থাকত, তাহলে তোমার জবাব মেনে নিতে সংকোচ করতাম না। কিন্তু বাস্তবিকই আমার মুশকিল হয়েছে। আমি তোমার কাছে সহানুভুতি চাইছি'', যোশি এই পরিপ্রেক্ষিতে লেখেন -''আমাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তিনিই যদি বলেন, আমার কথা মেনে নেবার পথে বাঁধা হল তাঁর কুসংস্কার, তা হলে আমার আর কিছু বলার থাকে না''।

গান্ধিজি যোশিকে লিখেছিলেন 'আমি তোমাদের গুণের কথা জানি।তোমাদের মধ্যে আছে খুবই কার্যক্ষম তরুণ তরুণী; যে নিঃস্বার্থতার দাবি আমি করতে পারি তা তারাও পারে।তোমরা সবাই কঠিন পরিশ্রম কর, কাজ করার ক্ষমতা তোমাদের খুবই বেশি।তোমাদের কর্মীরা কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলে। এ সব গুণ আমি খুবই পছন্দ করি,খুবই মুল্যবান মনে করি।'

এ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধির অনুমতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কমঃ পূরণ চাঁদ যোশির যে পত্র বিনিময় হয়েছিল তা ১৯৪৫ সালের ১ জুলাই 'গান্ধি-যোশি পত্রালাপ' শীর্ষক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এটি কলকাতার 'সেরিবান' প্রকাশন সংস্থা পুনরায় প্রকাশ করেছে। এটি আগ্রহী পাঠকরা ওই প্রকাশনা সংস্থা কতৃক প্রকাশিত ' জনযুদ্ধ দেশভাগ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, দলিল সংগ্রহ , ২য় খন্ডে' দেখতে পারেন।

কমিউনিস্টদের সম্পর্কে জওহরলাল নেহরুর ছিল অত্যন্ত শ্রদ্ধার মনোভাব। তিনি বলেছিলেন " কমিউনিস্টরা হলেন সেই মানুষ যাঁরা চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সোভিয়েত দেশের বাইরে, কমিউনিস্টদের বিস্তর বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। আমি বরাবর তাঁদের অশেষ সাহস আর আত্মত্যাগের ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। অগণিত মানুষ যেমন দুঃখক্লেশ ভোগ করে, সেইমত তাঁরাও প্রচুর কষ্ট পান, কিন্তু অশুভঙ্কর সর্বশক্তিমান অদৃষ্টের সামনে চোখ বন্ধ করে নয়। তাঁরা দুঃখ বরণ করেন মানুষের মতন, সেই ক্লেশ স্বীকারের মধ্যে থাকে একটা সকরুণ মহিমা। ❐

পাঁচ বছর পর স্বস্থানে পৌষ উৎসব

শুভ বসু

.....

শান্তিনিকেতনের উৎস কলকাতার নবোত্থিত বাবুসমাজের মধ্যে। সেই বাবু সমাজে ছিলেন জমিদার শ্রেণীর মানুষ। দ্বারকানাথ ঠাকুরের অভিলাষ ছিল বাংলার শিল্পপতি হবার। কিন্তু ১৮৪৮ সালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এর পতনের পর কার-তাগোর কোম্পানি ধীরে ধীরে ব্যবসার জগৎ থেকে সরে এসে জমিদারি পরিচালনায় নজর দেওয়া। সেই সূত্রেই দেবেন্দ্রনাথের বীরভূমের রায়পুরে সিংহ পরিবারের নেমতন্ন রক্ষার্থে ছাতিম তোলার সঙ্গে পরিচয়। তারপরে সেই স্থানে শান্তিনিকেতনের স্থাপনা। কিন্তু শান্তিনিকেতনের স্থাপনার মধ্যে আরো একটা আধাত্মিক জীবন জিজ্ঞাসা লুকিয়েছিল। সেই সঙ্গে জীবন জিজ্ঞাসার প্রকাশ হলো উপনিষদের মধ্যে থেকে উদ্ভূত একেশ্বরবাদ এবং ঈশ্বরের বিমূর্ত ধারণার প্রতি আকর্ষণ। সেই খ্রিস্টীয় সমাজের প্রভাবে এক নির্দিষ্ট সভার মধ্যে আচার্য্যর উপস্থিতিতে প্রার্থনা করার। রামমোহন এর উপরে মুতাযিলাদের প্রভাব বিশেষত ওয়াসিল ইবনে আতা র প্রভাব গভীর ভাবে ছিল। দেবেন্দ্রনাথের উপরে সুফী প্রভাব এসেছিলে তাঁর হাফিজের প্রতি অনুরাগ থেকে। রামমোহন এবং দেবেন্দ্রনাথ দুজনেই ফার্সি ভাষার আলেম ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ হাফিজের কবিতা তাঁর উপাসনার সময়ে উচ্চারণ করতেন। হাফিজের কবিতা র ইংরেজি অনুবাদ দিলাম তাঁর কাব্য প্রতিভার স্বাক্ষর হিসাবে —

Who Has Bid Thee Ask No More
Hafez
English translation by Gertrude Lowthian Bell
Beloved– who has bid thee ask no more
How fares my life Ú to play the enemy
And ask not where he dwells that was thy friend

Thou art the breath of mercy passing over
The whole wide world– and the offender I —
Ah– let the rift my tears have channelled end–
Question the past no more

দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন কে তাঁর প্রাণের আরাম মনের আনন্দ এবং আত্মার শান্তি হিসাবে দেখেছিলেন। তাঁর কাছে শান্তিনিকেতন ছিল এক নিরিবিলিতে ঈশ্বরের উপাসনার কেন্দ্র। সেই উদ্দেশ্যে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাসনা মন্দির স্থাপন করেন ১৮৯১সালে। তখন থেকেই ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে প্রতি বুধবার সকালে উপাসনা হয়। সেই সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষা দিবস ৭ ই পৌষ উপাসনা এবং মেলার আয়োজন করা হয়। তার মধ্যে দিয়ে বীরভূমের অজ পাড়া গ্রামের সঙ্গে কলকাতার সংযোগ স্থাপিত হয় পৌষ উৎসবের মধ্যে দিয়ে। কলকাতার বাবুসমাজে মন্দির স্থাপনার সংবাদে অনেকেই বোলপুরের পাশে গ্রামে এই মন্দির স্থাপনে উপলক্ষ্যে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বীরভূমের যোগসূত্র ছিল ঔপনিবেশিক আমলে স্থাপিত রেল গাড়ি। অর্থাৎ গ্রাম বাংলা , নগর বাংলা সুফী চিন্তা এবং সর্বোপরি উপনিষদের ভিত্তিতে উনিশ শতকের কলকাতার বাবুসমাজের আধাত্মিক জীবন জিজ্ঞাসা এবং জমিদার প্রথার থেকে আগত উদ্বৃত্ত এবং ঔপনিবেশিক আধুনিকতা এই সবের সঙ্গে যুক্ত এই পৌষ উৎসবের উৎস। আমার মনে হলো খ্রিস্তৎসবের প্রাক্কালে পৌষ উতসবের উৎস চর্চা করে দেখি। বাংলার সমাজের এক গভীর পট পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত এই উৎসব। আবার হাফিজ বলেছেন অতীত কে প্রশ্নবিদ্ধ করো না।

শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট এবং বিশ্বভারতীর যৌথ উদ্যোগে বেশ কয়েক বছর পর এবার পৌষ উৎসবের আয়োজন করা হয় পূর্বপল্লীর মাঠে। বীরভূম জেলা প্রশাসনও এই উৎসবে সহযোগিতা করে। প্রথামত ৬ পৌষ (২২ডিসেম্বর) রাতে গৌর প্রাঙ্গনে বৈতালিকের মধ্যে দিয়ে উৎসবের সূচনা ঘটে। আজি যত তারা তব আকাশে, গানটি গাইতে গাইতে আশ্রমিকেরা ছাতিমতলা পরিক্রমা করে। সেই সঙ্গে সর্ব প্রাচীন শান্তিনিকেতন বাড়ির থেকে ভেসে আসে সানাইয়ের সুর। সমগ্র আশ্রমে ছড়িয়ে পড়ে সেই সুরের অনুরনণ।

৭ই পৌষ প্রত্যুষে ছাতিম তলায় উপাসনার মধ্যে দিয়ে পৌষ উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘটে। উপাচার্য মহাশয়ের পৌরহিত্যে এবং উপনিষদের মন্ত্র পাঠের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় একেশ্বরবাদ এবং ঈশ্বরের বিমুর্ত ধারণার প্রতি শান্তিনিকেতনের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। উপাসনার শেষে ‘করো তার নাম ও গান ‘, গানটি গাইতে গাইতে ছাতিমতলা প্রদক্ষিণ করে আশ্রমবাসীর দল উত্তরায়নে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ জ্ঞাপন করে। পৌষ মেলা মাঠে প্রতিবছরের মত বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে একটি প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ছিল সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেব . প্রদর্শনী এবং নানাবিধ হস্তশিল্পেরদোকান। প্রদর্শনী প্রাঙ্গণ পেরিয়ে প্রতিবছরের মত এ বছরও খেলনা, খাবার এবং পরিধেওবস্ত্র, নাগরদোলা, লোহার যন্ত্রপাতির দোকান চোখে পড়ে।

এছাড়াও মেলার অন্যতম আকর্ষণ সংস্কৃতি মঞ্চে বাউল গান, কীর্তন, রায়বেঁশে নৃত্য, ব্রতচারী নৃত্য যাত্রাপালা প্রভৃতি। পৌষমেলা চলাকালীন আশ্রমের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হয় আশ্রমিক সংঘের বার্ষিক অধিবেশন , পরলোকগত আশ্রমবাসীর স্মৃতি বাসর, আলাপিনী মহিলা সমিতির অনুষ্ঠান প্রভৃতি। পৌষ উৎসবের তৃতীয় দিনটিতে, পরোলোকগত আশ্রম বাসীদের স্মৃতিতে পাঠভবন ছাত্রাবাসে হবিষ্যন্যের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যাবেলায় অনুষ্ঠিত হয় খ্রিস্টোৎসব। উপনিষদ থেকে মন্ত্র পাঠ যীশুখ্রিস্টের জীবন পর্যালোচনা এবং রবীন্দ্র সংগীত ও ক্যারোল পরিবেশন এর মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয় এই অনুষ্ঠানে।

বেশ কয়েক বছর পর শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট এবং বিশ্বভারতীর উদ্যোগে আয়োজিত এই পৌষ উৎসবে এবার ব্যাপক জনসমাগম হয়। ❐

কাজী আবদুল ওদুদ ও তাঁর বাংলা

মিলন দত্ত

.....

(৩)

সুনীতিকুমারকে উধৃত করে আগেই বলেছি, ইসলাম ধর্মে গভীর আস্থা ছিল ওদুদের। হজরত মহাম্মদকে তিন কেবল ধর্মপ্রবর্তকই মনে করতেন না, জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে যে জীবন চেতনার প্রয়োজন তারও অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেছেন তাঁর জীবনে। তাই সাহিত্য জীবনের শুরুতেই তিনি গ্যেটে, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি হজরত মুহাম্মদকেও জীবন চেতনার আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। অথচ মুসলমান সমাজের একটা বড় অংশ তাঁকে বরাবরই ভুল বুঝেছে। খন্দকার সিরাজুল হক জানিয়েছেন, ‘নজরুলের মতো তাঁকেও কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে। এর কারণ সহজেই অনুমেয়। সাহিত্য জীবনের প্রারম্ভেই তিনি ‘সম্মোহিত মুসলমান’ নামক প্রবন্ধ লিখে ধর্মান্ধ আলেমদের মধুচক্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করেছিলেন।’

পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করেননি ওদুদ। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সমঝোতার ফলে সত্যি যখন দেশটা ভাগ হয়ে গেল তখন তিনি তা বাধ্য হয়ে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের শরিয়তি শাসন প্রবর্তনের কথা উঠলে তিনি তার বিরোধী মত স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘শরিয়তের পুনঃপ্রবর্তন অবশ্য অসম্ভব, কেননা অতীত অস্তমিত, মৃত। তার যে অংশ সজীব সে তুমি ও আমি। অতীত পুনর্জীবিত হবে না।’ এই প্রসঙ্গে আবদুল হক জানাচ্ছেন, ‘সাম্প্রদায়িকতার আরেক রূপ প্যানইসলামি চিন্তাধারাও তিনি সমর্থন করেননি। তাঁর মতে প্যানইসলামি চিন্তা মুসলমানকে বহির্মুখী করে, এবং স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি করে উদাসীন।’ ১৯৪৬ সালে একটি প্রবন্ধে (গৃহযুদ্ধের প্রাক্কালে) ওদুদ দ্বিজাতিত্বত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ নিয়ে তাঁর মতকে স্পষ্ট করে বলেছেন এই ভাবে, ‘আমাদের নব-নেতাদের গভীরভাবেই ভাবা উচিত বাংলার মুসলমানের সঙ্গে পাঞ্জাবের মুসলমানের অঙ্গাঙ্গী যোগ ঘটাতে গিয়ে দুইয়েরই বিকাশ ব্যহত করার মতো মহা অনর্থ তাঁরা ঘটাবেন কিনা।’ খোন্দকার সিরাজুল হক ওদুদের এই ভবিষ্যতবাণীর সফলতা দেখেছেন ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের জন্মের ভিতরে। আজ বাংলাদেশের কিছু ‘ছাত্র-জনতা’ কথাকথিত ‘বিপ্লব’ সংগঠিত করে ক্ষমতা দখলের পরে বাংলাদেশের মানুষের সেই সফলতা আর অর্জনতে ব্যর্থ করে দিতে উদ্যত হয়েছে।

'সংস্কৃতির কথা' প্রবন্ধেও উদুদ একই কথা বলেছেন অন্য ভাবে, 'যাঁরা বলছেন, হিন্দু-মুসলমানের পৃথক রাষ্ট্র-জীবন ভিন্ন এর সমাধান নেই তাদের কথা বোঝা যাচ্ছে না এই কারণে যে রাষ্ট্র-জীবনের অর্থ হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রভূত ক্ষমতা সমন্বিত সংহত জীবন, কিন্তু ভারতবর্ষের মতো ভৌগোলিক অবস্থানের দেশে সেই ক্ষমতা সমস্ত দেশের পক্ষে লাভ হওয়াই সম্ভবপর মনে হয়, প্রদেশ বিশেষের বা অংশবিশেষের তা একান্তই দুঃসাধ্য।' তাঁর এই এককেন্দ্রিক ভারতবর্ষত্বের তত্ত্বের সঙ্গে আমরা একমত নাও হতে পারি। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের প্রশ্নটাকে তিনি যেভাবে দেখেছেন তা আজও আধুনিক অতএব প্রাসঙ্গিকও। তিনি মনে করতেন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সার্থক ঐক্য হলে তবেই সার্থক সংস্কৃতি-চিন্তার স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব। এই বিষয়ে তাঁর সুপারিশ ছিল ।

১. দেশে অভুক্ত ও কর্মহীন কেউ থাকবে না।
২. একান্ত বীভৎস না হলে কোনও সমাজেরই ধর্মচার অশ্রদ্ধেয় বিবেচিত হবে না। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে যে প্রাচীন বলেই বরণীয় নয়, বরণীয় তার বর্তমান কার্যকারিতার জন্য।
৩. হিন্দু-মুসলমানের নামের ব্যবধান থাকবে না অথবা অস্বীকার করা হবে।
৪. সামাজিক আদান-প্রদান-বিবাহ আদি সমেত; সর্বত্র সহজ হবে।
৫. আইন গোটা দেশের জন্য 'এক হবে'।

এমন একটা সমাজ আজও আমাদের অধরা থেকে গিয়েছে। তার এইসব চিন্তার বাস্তবায়ন কতটা সম্ভব তা নিয়েও পরবর্তীকালে কথাবার্তা কম হয়নি। যেমন ওদুদ মনে করতেন, বিভিন্ন ধর্ম ব্যবস্থার ত্রুটিই এই সম্প্রদায়গুলিকে সমন্বিত করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এই ধর্মের খানিকটা, ওই ধর্মের খানিকটা ত্রুটি মেরামত করে নিতে পারলেই সৌহার্দ্য স্থাপন করা যাবে। আসলে সারাটা জীবন তিনি সমন্বয়ের দর্শনের অন্বেষণ করেছেন। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কারণ যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাতও হতে পারে এবং ধর্ম এই বিরোধে একটা প্রতীক মাত্র, কিংবা তা কখনও ছুতো হিসেবে ব্যবহার হতে পারে, তা নিয়ে তিনি কখনও ভাবেননি। আবার ধর্মীয় বিরোধে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের ধার ধারতেন না। সেটাও তাঁর নজর এড়িয়ে গিয়েছে বলেই মনে হয়। ফলে ওদুদের মূল্যায়ন করতে বসে অনেকেই তাঁর তত্ত্বগুলোকে অবাস্তব, অসম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু খোন্দকার সিরাজুল হকের মতে, 'ওদুদের ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হয়নি, খকলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নোয়াখালীর হাঙ্গামা, বঙ্গব্যবচ্ছেদ ও গান্ধী হত্যার মতো ঘটনা ঘটে গেছে। পরিশেষে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে পূর্ববঙ্গে মহা অনর্থ ঘটে গিয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের অসারতা প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ 'জবরদস্ত' রাজনীতিবিদদের কাছে গৃহীত না হলেও কালক্রমে দেশের (বাংলাদেশের) জনসাধারণ তার পন্থাকে গ্রহণ করেছে।'

মুসলমান সমাজের সংস্কার প্রচেষ্টা আর হিন্দু মুসলমানের সমন্বয়ের সাধনা করতে গিয়ে কাজী আবদুল ওদুদকে সারাটা জীবন সইতে হয়েছে লাঞ্ছনা; নিজের সমাজ থেকে তো বটেই বাইরে থেকেও। তাঁকে কেউ বলেছেন 'মুসলমান ধর্ম বিরোধী' আবার পূর্ববঙ্গের লোক হয়েও দেশভাগের পরে পাকিস্তানে না যাওয়ায় কেউ তাঁকে বলেছেন 'সমাজত্যাগী'। কেউবা তাঁকে হিন্দু ভাবধারার মানুষ বলে বিদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। 'কাজী আবদুল ওদুদের সাধনা কি ব্যর্থ হল তাহলে? যে সমাজে তাঁর জন্ম, যে পরিমণ্ডলের মধ্যে তাঁর বিদ্রোহ ঘোষণা, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর চিন্তাধারা কি গুরুত্ব হারালো?' এই প্রশ্ন তুলেছেন আনিসুজ্জামান। আবার তিনিই তার জবাব দিয়েছেন, 'না তা হয়নি'। আনিসুজ্জামান কৃত উদুদের মূল্যায়নের কিয়দাংশ এখানে প্রাসঙ্গিক, 'তিনি যতটা রসস্রষ্টা, তার চাইতে চিন্তাশীল হিসেবে অনেক বড়, যত বড় সাহিত্য-সমালোচক তার চাইতে বড় সমাজ সংশোধক। এই চিন্তা, এই সংশোধনপ্রয়াস খুব ব্যপকতা লাভ করতে পারেনি; এ এদিনেও তা সর্বব্যাপী হতে পারে না। কিন্তু যে প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেছিলেন, যে জীবন-চেতনার স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন তা বহুজনকেই নাড়া দিয়েছে। তার প্রমাণ আমাদের সমাজে (বাংলাদেশে) অসাম্প্রদায়িক চেতনার সমৃদ্ধিতে, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে, জীবনকে নতুন করে দেখবার প্রয়াসের মধ্যে নিহিত।'

আনিসুজ্জামানের কথা পুরোপুরি মেনে নিলেও বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যাগুরুর মৌলবাদী উত্থানকে তো আর অস্বীকার করতে পারি না। সংখ্যাগুরুর মৌলবাদ এখন নগ্ন নির্লজ্জ, বড় বেশি অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে। সে বাংলাদেশই হোক বা ভারত। এ দেশে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভেঙে সেখানে সরকারি সদতে এবং সুপ্রিম কোর্টের সহায়তায় রাম মন্দির নির্মাণের গোটা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোত ছিল সংখ্যালঘু মুসলমানকে কোণঠালা করে তোলার প্রক্রিয়া। তার সঙ্গে বলাইবাহুল্য, জড়িয়ে রয়েছে নানা ছুটো-নাতায় মুসলমানদের ওপর অত্যাচার। পশ্চিমবঙ্গও তার আঁচ থেকে দূরে থাকেনি। এ রাজ্যে এখন সাম্প্রদায়িক হিংসা প্রায় নিত্যকার ঘটনা। আর বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের অবস্থা এখন গোটা বিশ্ব জানে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে নতুন তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে সে দেশে সংলঘু নির্যাতন এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। সংখ্যালঘু মানুষের মধ্যে স্থায়ী আতঙ্ক কি কোনও সমাজের জন্য ভাল তবে পারে!

কাজী আবদুল ওদুদ প্রায় শতবর্ষ আগে এমনই এক সময়ের মধ্যে তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন। অত্যন্ত লজ্জার এবং বেদনার কথা, সেই যাত্রায় আজও আমরা সামিল। আমাদের সন্তানদের এই পথেই হাঁটতে হবে। দুই সম্প্রদায়কে কাছাকাছি নিয়ে আসতে ওদুদ যে কাজগুলো করেছিলেন তা আজও কত অপরিহার্য তারই কিছুটা বোঝার চেষ্টা করেছি এ লেখায়।

আবার বাঙালি মুসলমান সমাজের সংস্কার থেকে মুক্তি এবং নবজীবন চেতনায় উত্তরণে ওদুদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর জীবনাদর্শ ও সাহিত্যসাধনার পথপরিক্রমা ইউরোপীয় রেনেসাঁর আলোয় আলোকিত। বাঙালি মুসলমান সমাজের কূপমণ্ডুকতা, কাণ্ডজ্ঞানের অভাব তাঁকে পীড়িত করেছে। অন্নদাশংকর লিখছেন, 'কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন জাতিতে ভারতীয়, ভাষায় বাঙালি, ধর্মে মুসলমান, জীবন দর্শনে মানবিকবাদী, মতবাদে রামমোহনপন্থী, রাজনীতিতে গান্ধী ও নেহরুপন্থী, অর্থনৈতিক শ্রেণি বিচারে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, সামাজিক ধ্যানধারণায় ভিক্টোরিয়ান লিবারেল। কোনও চরমপন্থায় তার বিশ্বাস ছিল না।'

আমরা এ কথার প্রমাণ পাই ১৯১৯ সালে প্রকাশিত প্রথম 'নদীবক্ষে' উপন্যাসেই। পদ্মাপাড়ের বাগমারা গ্রামে বড় হয়ে ওঠা ওদুদ তুলে ধরেছিলেন উত্তাল পদ্মার বুকে মাঝিদের সংগ্রামমুখর জীবন ও সাধারণ কৃষকদের চালচিত্র। প্রান্তিক মানুষের জীবনের দুঃখ-বেদনার ওপর ভিত্তি

করে গড়ে ওঠা গ্রামীণ কৃষি জীবনের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা অনবদ্য। প্রশংসিত হয়েছে অনেক। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ওদুদের উপন্যাসের বিষয়বস্তুর নতুনত্ব, মাধুর্য ও সহজিয়া সুর পাঠককে মুগ্ধ করে। এইভাবে আলোড়ন তোলে।'

মুসলমান সমাজের সংস্কার প্রচেষ্টা আর হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় সাধনা করতে গিয়ে ওদুদকে সারা জীবন লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে; তার নিজের সমাজ থেকে তো বটেই বাইরে থেকেও। রক্ষণশীল সমাজের কাছে নিগৃহীত হয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলামও। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর এক সভায় বক্তৃতা করার সময় তা নিয়ে বিদ্রূপও করেন তিনি। নজরুল বলেন, 'আজ আমি দেখছি এখানে মুসলমানের নতুন অভিযান শুরু হয়েছে। আমি এই বার্তা চতুর্দিকে ঘোষণা করে বেড়াব। আর একটা কথা, এতদিন মনে করতাম আমি একাই কাফের, কিন্তু আজ দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম যে, মৌলভী আনোয়ারুল কাদির প্রমুখ কতগুলি গুণী ব্যক্তি দেখছি আস্ত কাফের। আমার দল বড় হয়েছে, এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আর আমি চাই না।'

কলকাতার বেকবাগানে ৮/বি, তারক দত্ত রোডের বাড়িতে ১৯৭০ সালের ১৯ মে কাজী আবদুল ওদুদের মৃত্যু হয়, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ছিয়াত্তর। আমৃত্যু ভারতীয় থাকতে চেয়েছিলেন ওদুদ। তাই জন্মমাটি পূর্ববঙ্গের মায়া ত্যাগ করে এবং পাকিস্তান সরকারের লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব ত্যাগ করে তিনি কলকাতাতেই থেকে গিয়েছিলেন।

(সমাপ্ত)

মানুষ মর্মমূলে ধর্ম বিরোধী

হুমায়ুন আজাদ

.....

বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর 'আমি কেন খ্রিস্টান নই' বইটিতে বলেছেন 'সব ধর্মই ক্ষতিকর ও অসত্য।'

কোন অলৌকিক জগত থেকে কেউ ধর্ম পাঠায়নি। যদিও এটা বিশ্বাস করার নির্দেশ দিয়ে, ভয় দেখানো হয়। কোন অলৌকিক জগত নেই, মানুষ নিয়ে কোন অলৌকিক সত্তার কোন উদ্বেগ নেই। মহাবিশ্বে মানুষ খুবই ক্ষুদ্র। ধর্ম অলৌকিক নয়, ধর্মগ্রন্থ বিধাতার বা দেব-দেবীর প্রণীত নয়। ধর্ম লৌকিক, ধর্মগ্রন্থ মানুষের প্রণীত।

মানুষ উদ্ভাবনশীল, ধর্ম হল মানুষের অজস্র উদ্ভাবনের একটি এবং সম্ভবত নিকৃষ্টতম। ধর্মকে শাশ্বত ও সর্বজনীন মনে করার একটা চাপ রয়েছে। তবে ধর্ম শাশ্বতও নয় সর্বজনীনও নয়। কোন ধর্ম নেই যা মানুষ সৃষ্টির সময় থেকে চলে এসেছে ও চিরকাল চলবে। এমন কোন ধর্ম নেই যাতে সবাই বিশ্বাস করে। অনেক সত্য আছে যা সবাই শুধু বিশ্বাস নয় স্বীকার করে। কিন্তু বিশেষ একটি ধর্ম ও তার বিধাতাকে বিশ্বাস করে শুধুমাত্র সেই ধর্মের মানুষ। অন্য ধর্মের মানুষের কাছে তা হাস্যকর ও অনেক সময় ঘৃণার বিষয়।

চারপাশের ধর্ম দেখে মনে হতে পারে যে, মানুষ ধর্ম ছাড়া বাঁচতে পারে না। সত্য হচ্ছে, ধর্মের মধ্যে মানুষ বেশিক্ষণ বাঁচতে পারে না। মানুষ মর্মমূলে ধর্ম বিরোধী। মানুষের পক্ষে বেশি ধর্ম সহ্য করা অসম্ভব। ধার্মিকরা যতটা ধার্মিক, তার থেকে অনেক বেশি অধার্মিক। মানুষের সৌভাগ্য মানুষ বেশি ধর্ম সহ্য করতে পারেনা, তাই পৃথিবীতে বিকাশ ঘটেছে মানুষের। বেশি ধর্মে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে, বেশি ধার্মিক মানুষ অসুস্থ মানুষ।

মানুষ যদি আপাদমস্ত ২৪ ঘন্টা, ৩০ দিন, বারো মাস ধার্মিক প্রাণী হতো, তাহলে আজও থাকতো আদিম অবস্থায়। মানুষের মনের আদিম অংশটুকু ধর্ম। ধার্মিক মানুষকে প্রশংসা করার একটা রীতি প্রচলিত রয়েছে। বলা হয় যে প্রকৃত ধার্মিক মানুষ খুব ভালো মানুষ। কিন্তু সত্য তার উল্টো, প্রকৃত ধার্মিক মানুষ প্রকৃত খারাপ মানুষ। সে অ-বিকশিত এবং মানুষের বিকাশের বিরোধী। হিন্দু-ইহুদি-খ্রিস্টান-মুসলমান সবাই যদি হতো প্রকৃত হিন্দু-ইহুদি-খ্রিস্টান বা মুসলমান, তবে তারা আজও বাস করত পাঁচ থেকে দেড় হাজার বছর আগের সমাজে। ধর্ম মানুষকে এগিয়ে দেয়নি, ধর্ম থাকা সত্ত্বেও মানুষ এগিয়েছে।

কারণ?

মানুষ কখনোই পুরোপুরি ধার্মিক নয়। মানুষ কখনোই ধর্মের বিধান পুরোপুরি মানেনি, মানা সম্ভবও নয়। ধর্মের কোন উপকারিতা দেখা যায়নি। কিন্তু অজস্র অপকারিতা সব সময়ই দেখা যায়। প্রত্যেক ধর্মে রয়েছে দুটি দিক ধর্মগুলো নিজেদের দায়িত্ব হিসাবে ব্যাখ্যা করে বিশ্ব সৃষ্টির রীতি এবং তৈরি করে সামাজিক বিধান। ধর্মের বইগুলি বিজ্ঞানের বই নয়, ওগুলো খুবই অবৈজ্ঞানিক। এগুলোতে বিশ্ব সৃষ্টির যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা পুরোপুরি ভুল। ওই বইগুলো রচনাকালের মানুষের কল্পনা মাত্র। বিশেষ এক ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল ধর্মপ্রবর্তকদের লক্ষ্য। তাই ধর্ম মূলত আদিম রাজনীতি।

মৃত্যুর পর মানুষের পরিণতি বর্ণনা ধর্মের এক প্রিয় বিষয়। এব্যাপারে ধর্মগুলো মানুষকে লোভ এর পর লোভ আর ভয়ের পর ভয় দেখায়। মৃত্যুর পর মানুষের পরিণতি সম্পর্কে ধর্মগুলো যা বলে তা হাস্যকর। যাতে বিশ্বাস করতে পারে শুধু লোভী মানুষরা।

মানুষ সম্পর্কে খুবই নিম্ন মানের ধারণা পোষণ করে ধর্মগুলো। ধর্মগুলো ধরে নিয়েছে যে মানুষ লোভী ও ভীতু। তাই তাদের লোভ দেখাতে হবে এবং রাখতে হবে সন্ত্রস্ত করে। ধর্মগ্রন্থ পড়ার সময় ধার্মিক মানুষ বারবার লোভে পড়ে, আর ভয়ে কেঁপে ওঠে। তাই ধার্মিক মানুষের পক্ষে সুস্থ থাকা সম্ভব নয়। লোভ ও ভয়ের মধ্যে বাস করে তারা হয়ে পড়ে বিকলনগ্রস্ত।

ধার্মিকরা খুবই অমানবিক, তারা নিজেদের ধর্ম ও ধর্ম বই ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বা ধর্মের বইকে মর্যাদা দেয় না। এক ধর্মের ধার্মিক অন্য ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ ও গৃহকে অবলীলায় অপমান করতে পারে। নাস্তিকরা কিন্তু কখনো এইসব করে না। যেকোনো নির্বোধের পক্ষে ধার্মিক হওয়া সহজ। কিন্তু শুধু জ্ঞানী ও মানবিক ব্যক্তি হতে পারে নাস্তিক।

নাস্তিক হত্যা বা ধ্বংস করে না। কিন্তু ধার্মিক সবসময়ই হত্যা ও ধ্বংসের জন্য ব্যগ্র থাকে। তারা ইতিহাসের পাতাকে যুগে যুগে রক্তাক্ত করেছে। প্রত্যেক ধর্মে রয়েছে অসংখ্য সন্ত, যারা ঠান্ডা মস্তিষ্কের হত্যাকারী। নাস্তিক চায় মানুষের চেতনাকে বদলে দিতে, মানুষকে বিকশিত করতে। আর ধার্মিকরা চায় মানুষের চেতনাকে নষ্ট করতে, মানুষের ভাবনা চিন্তাকে রুদ্ধ করতে। ধার্মিকদের নৈতিকতাবোধ খুবই শোচনীয়।

বহু ধর্ম রয়েছে পৃথিবীতে একটা সরল প্রশ্ন জাগতেই পারে। বিধাতা যদি থাকেন, এবং তিনি যদি একলাই স্রষ্টা হন, তবে তিনি কেন এত ধর্ম সৃষ্টি করলেন ? তিনি একটি ধর্ম পাঠালেই তো পারতেন এবং আমরা পরম

বিশ্বাসে সেটি লালন-পালন করতে পারতাম। তিনি তা করেননি, কেন ?

তবে কি তিনি একলা নন? ওই অলৌকিক জগতেও কি রয়েছে বহু প্রতিদ্বন্দ্বী, যারা মানুষের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র? তাদের কেউ হিন্দুর, কেউ ইহুদির, কেউ খৃষ্টানের, কেউ মুসলমানের এবং কেউবা ঙ-র, কেউ চ-র, কেউ ছ-জ-ঝ-র ?

স্রষ্টা যদি একজনই হন, তাহলে এত ধর্ম সৃষ্টি করে কেন তিনি বিভ্রান্ত করেছেন মানুষকে ? ❐

অন্য ধারার চলচিত্রের পুরোধা

শ্যাম বেনেগাল

শুভ মিত্র

.....

অন্য ধারা বা সমান্তরাল অথবা নিউ ওয়েভ ছবি সম্পর্কে যদি কিছু বলতে হয় তাহলে অবধারিতভাবে যে নামটি উঠে আসবে তিনি শ্যাম বেনেগাল। এবছর তাঁর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচিত্র ' অঙ্কুর ' অর্ধশতাধীতে পা দিল। তিনিও পালন করলেন জন্মদিনের ৯০ বছর। নাসিরুদ্দিন শাহ, শাবানা আজমি , কুলভূষণ খরবন্দাসহ চলচিত্র জগতের বহু তারকাদের সঙ্গে অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি সেদিন আনন্দ ভাগ করে নিয়েছিলেন।

তাঁর ছবির সঙ্গে আমার পরিচয় ' মন্থন' ছবিটির মাধ্যমে। ১৯৭৬ সালে ছবিটি তৈরী হয় ক্রাউড ফান্ডিং এর দ্বারা। ভারতের ইতিহাসে প্রথম। গুজরাটে দেশের প্রথম দুগ্ধ সমবায় গঠিত হয় দুগ্ধ বা শ্বেত বিপ্লবের পথিকৃত ডঃ ভার্গিস কুরিয়েনের ন উদ্যোগে। সেই রাজ্যের পাঁচ লক্ষ দুগ্ধ চাষী বা উৎপাদক প্রত্যেকে দুই টাকা করে দিয়ে এই ছবিটি নির্মাণ করা হয়।প্রতিদিন প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে গরুর গাড়ীতে চেপে কয়েক হাজার দুগ্ধ চাষী এই ছবির শুটিং দেখতে আসত। কারণ এটা যে তাদের নিজেদের জীবন ও কাজ নিয়ে নির্মিত ছবি। গিরিশ কারনাড , স্মিতা পাতিল ছিলেন মুখ্য চরিত্রে। মাত্র ১২ বছর বয়সে তার বাবা শ্রীধর ডি বেনেগালের কাছ থেকে পাওয়া ক্যামেরায় একটি স্বল্প দৈর্ঘের ছবি দিয়ে শুরু। লিটাস অ্যাডভারটাইজ -এ কপিরাইটার হিসাবে কাজ শুরু। অঙ্কুর ছবিটি তিনি যখন করলেন তার বিস্তৃতি ছড়িয়ে পড়ল দেশের কোণে কোণে। আদুর গোপালকৃষ্ণণ থেকে মনি কল তখন যথেষ্ট নাম ডাকওয়ালা পরিচালক। সালটা ১৯৭৩। এটাই ছিল তাঁর প্রথম ফিচার ফিল্ম। সত্যজিৎ রায় এই ছবি নিয়ে আলোচনার সঙ্গে ক্যামেরায় গোবিন্দ নিহালনির কাজেরও বিশেষভাবে প্রশংসা করলেন। এই ছবিতে অভিনয় করে শাবানা আজমি জাতীয় পুরস্কার জিতলেন। তারপর তিনি তাঁর বিভিন্ন ছবিতে অভিনয় করালেন বেশ কিছু নতুন কলাকুশলীদের। স্মিতা পাতিল,নাসিরুদ্দিন শাহ,অমরীশ পুরী,ওম পুরী,কুলভূষণ খরবান্দা,নীনা গুপ্ত প্রমুখ। তাঁর প্রতিটি ছবিতে উঠে এসেছে অন্য এক ভারতের কথা। ১৯৬২ সালে গুজরাটি ভাষায় নির্মিত হয় ' ঘর বেটা গঙ্গা'। এটি ছিল একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম। ১৯৭৫ সালে নিশান্ত, ১৯৭৬ সালে মন্থন, ১৯৭৫ সালে জুনুন, ১৯৭৭ সালে ভূমিকা, ১৯৮১ সালে কলিযুগ, ১৯৮৩ সালে মান্ডি, ১৯৮৫ সালে ত্রিকাল, ২০০১ সালে জুবেইদাসহ বেশ কয়েকটি ছবি উল্লেখ করার মত। তাঁর শেষ ছবি ''মুজিব, দ্য মেকিং অব এ নেশন''। ইতিমধ্যে তিনি জওহরলাল নেহেরুর ওপর একটি ছবি ছাড়াও তৈরি করেছেন দূরদর্শনের জন্য ৫৩ পর্বের ''ভারত এক খোঁজ'' যা দেশের ৫০০০ বছরের ইতিহাস মনে করিয়ে দেয়। মহাত্মা গান্ধিকে নিয়েও তিনি ছবি করেছেন। ২০০৫ সালে নেতাজীর ওপর ''দ্য ফরগটন হিরো'' ও ১৯৮২ সালে সত্যজিৎ রায়ের কাজ নিয়ে ডকুমেন্টারি করে ফেলেছেন। শেষ ছবিটি আমি দেখেছিলাম কয়েকবছর আগে সত্যজিত রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে সত্যজিৎ রায় মেমোরিয়াল সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত স্মারক বক্তৃতা, আইসিসিআরে। সেদিন শ্যাম বেনেগলের করা সত্যজিৎ রায়ের ওপর একটি অসাধারণ মূল্যায়নসহ বক্তৃতা আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে আমার স্মৃতির মণিকোঠায়। হিমসাগর এক্সপ্রেসের মধ্যে তাঁর তৈরী ভারতের রেলওয়ের যাত্রার ওপর ১৫ পর্বের ছবিটিও বিশেষভাবে দাগ কাটার মত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে অপারেশন বর্গা নিয়ে তৈরি আরোহণ,সংবিধান নিয়ে রাজ্যসভা টিভি সিরিজ -সবেতেই তিনি তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এরপর ওয়েলকাম টু সজ্জনপুর বা ওয়েল ডান আব্বা কিছুটা আগের ছবিগুলি থেকে আলাদা হলেও তাঁর মূল আঙ্গিক ও মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হননি। সুরজ কা সাতওয়া ঘোড়া বা চরনদাস চোর আবার এক ভিন্ন স্বাদের ছবি। কতই না বৈচিত্র্য তিনি দেখিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। নারীচরিত্রের সম্মান, সংখ্যালঘু নারীচরিত্রের ঠিকঠিক উপস্থাপনা বার বার তাঁর ছবিতে আমরা দেখেছি।

১৯৬৬ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত পুনের ভারতীয় চলচিত্র ও দূরদর্শন সংস্থায় শিক্ষকতা,দুবার সেখানকার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। ২০১৬ সালে তার নেতৃত্বে ফিল্ম সার্টিফিকেশন সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়।আবার সরকার যখন ২০২১ সালে সিনেমাটোগ্রাফি আইন সংশোধন করতে গেল তখন তিনি এর বিরোধীতা করেছিলেন,ছবিতে সেন্সরশিপের নামে এতবেশী কাঁচি চালানোর বিরোধী ছিলেন।

অর্থনীতির স্নাতকোত্তর শ্যাম পদ্মশ্রী পুরস্কার পান ১৯৭১ সালে,পদ্মবিভূষণ পুরস্কারে ভূষিত হন ১৯৯১ সালে, ২০০৫ সালে পেলেন দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার। নারী নির্যাতন,দেহ ব্যবসা,জাতিভেদ, বর্ণ,ধর্মের বিভেদ, গ্রামীণ ভারতের চালচিত্রের প্রতিফলিত হত তাঁর চিত্রনাট্যে। বিষয়ের বৈচিত্র্যের জন্যই নয় নয় করে আঠারোটি জাতীয় পুরস্কার তার ঝুলিতে আসে। চিরকাল সত্যজিৎ রায়ের ওপর শ্রদ্ধাশীল এই চিত্রপরিচালকের উত্তরসুরি বাসু চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ নিহালনি, মনি কাউলসহ বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এক গুপ্তচর স্পাই প্রিন্সপসকে নিয়ে তিনি কাজ করার পরিকল্পনা করেছিলেন, তা আর করা হল না। চলে গেলেন না ফেরার দেশে। রেখে গেলেন অসংখ্য গুণমুগ্ধ চলচিত্রপ্রেমী দর্শকদের।

শুভ বসুর সংযোজন

.....

১৯৮০ সালে উত্তর শিক্ষায় আমি যখন একাদশ শ্রেণীতে পড়ি তখন বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবনের প্রেক্ষাগৃহে অংশুমান, সুমন্ত্র (রাজা) এবং আমি

অংকুর ছবিটা দেখেছিলাম। হায়দরাবাদ দেশি রাজ্যের সামন্ত প্রভুদের দাপটের বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষের প্রতিবাদের অঙ্কুরোদ্গম নিয়ে সেই ছায়া ছবি। তারপরে মন্থন। গুজরাটের গ্রামের জাতপাত , দারিদ্র বঞ্চনার বিরুদ্ধে দলিতদের উত্থানের এক মন ছুঁয়ে যাওয়া কাহিনী। ড রায়ের চরিত্র এক অপূর্ব চরিত্র। মধ্যবিত্ত মানসিকতা, তাঁর উপর মিথ্যা মামলা এবং তাঁর গ্রাম ছেড়ে চলে আসার গল্প। অংকুর এবং মন্থন গ্রামের শ্রেণী সংগ্রামের গল্প। তার নানা দ্বান্দ্বিক টানা পোড়েনের ছবি । আমার মুগ্ধতা তখন থেকেই ছিল।

তারপরে দেখলাম ' জুনুন'। ১৮৫৭ র মহাবিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরী ছবি। আমার ছোটবেলায় ১৮৫৭ র মহাবিদ্রোহ নিয়ে আগ্রহ ছিল। একটি বিদ্রোহের মধ্যে আর একটি বিদ্রোহ তার ভিতরে আর একটি ১৮৫৭ র মহাবিদ্রোহ ছিল ভারতের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। সুদূর লন্ডন থেকে মার্ক্স যে রকম ১৮৫৭-র বিদ্রোহ নিয়ে লিখেছিলেন সেই রকমই ভারতের দক্ষিণ পন্থী হিন্দুত্ববাদের তাত্ত্বিক সাভারকার ১৮৫৭ র মহাবিদ্রোহ নিয়ে লিখেছিলেন। বাংলার বিপ্লবী প্রমোদ সেনগুপ্ত এবং নারীবাদী লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীও ১৮৫৭ র মহাবিদ্রোহ নিয়ে লেখেন। কিন্তু 'জুনুন' হলো সেই বিদ্রোহের আঙ্গিকে এক প্রেমের গল্প। কিন্তু সেই সঙ্গে তার ভিতরে আর একটি গল্প রয়েছে। সেটি হলো সে যুগের মুসলিম আশরাফ শ্রেণীর গল্প।

অধিকাংশই ভারতীয় ছবিতে মুসলমান আশরাফ শ্রেণী কে একটি ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে দেখানো হয় যারা নিজেদের জীবন যাত্রায় এতটাই আত্মনিমগ্ন যে বাইরের জগতের পরিবর্তন সম্পর্কে অনুৎসাহী বা তাদের সঙ্গে বাইজি সংস্কৃতির যোগাযোগ বা মুঘল রাজা বাদশাহর কাহিনী। কিন্তু এখানে এক জটিল প্রেমের কাহিনীর সঙ্গে রয়েছে মহাবিদ্রোহের নায়কের যোগাযোগ। ইতিহাসের নির্মোহ বিশ্লেষণের সঙ্গে প্রেমের সংস্থাপন।

আমার আরো প্রিয় ছায়াছবি হলো মাম্ম। আমাদের দেশ বিভাজনের রেখার যে দরিদ্র শ্রমজীবী মহিলার জীবনে কোন মানে নেই এই ছায়াছবি দেখে আমার তাই মনে হয়েছিল। মুম্বাইয়ের বস্তির গল্প এবং তার সঙ্গে দেশ বিভাজনের গল্প এবং শ্রেণিবিন্যাসের এক অপূর্ব ছায়া ছবি। আমার যৌবনে তাঁর ' ভারত এক খোঁজ' , নেহেরুর 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' অবলম্বনে এক অসাধারণ ধারাবাহিক তথ্যচিত্র দেখে বড় হয়েছি । তিনি দুই বাংলার দুই মহানায়ক নিয়ে যে ছায়াছবি করছিলেন তাতে আমি কোনোদিন আগ্রহান্বিত বোধ করি নি। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুর উপর ছবি তাঁর জীবনের দুর্বলতম পরিচালনা। রাষ্ট্রর নির্দেশে ছবি বানালে যা হয়।

তাঁর সহ কর্মীরা সেকালের সামাজিক ভাবে দায়বদ্ধ প্রগতিশীল লেখক সংঘের ইসমাত চাগতাই, মুম্বাইয়ের দুই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রী নাসিরুদ্দিন শাহ এবং শাবানা আজমী এবং প্রবাদ প্রতিম অভিনেতা এবং শেক্সপিয়ার এর উপর পঠন এবং অভিনয়ের গুনে গুণান্বিত শশী কাপুর এর যে গোষ্ঠী তা আজকের দিনে আমার কাছে রূপকথার মতো লাগে। শ্যাম বেনেগাল এক অবিস্মরণীয় নাম ভারতীয় ছায়াছবির জগতে এবং প্রতিবাদী সংস্কৃতির জগতে। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তিনি অবিনশ্বর। ❐

পণ্ডিত জাকির হুসেন

(১৯৫১-২০২৪)

.....

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রখ্যাত তবলা বাদক এবং সঙ্গীতশিল্পী জাকির হুসেন গত ১৫ ডিসেম্বর, ৭৩ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অগ্রগণ্য এই মহান শিল্পীর প্রয়াণ সঙ্গীতের একটি যুগের সমাপ্তি ঘটাল। সান ফ্রান্সিসকোর হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৭৩ বছর বয়সি জাকির দীর্ঘ দিন ধরেই ফুসফুসের বিরল রোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'ইডিয়োপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস'। সেই সংক্রান্ত জটিলতা নিয়েই বিগত দু'সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তরিত করানো হয়। ভেন্টিলেটরে রাখা হলেও শেষরক্ষা হয়নি।

১৯৫১ সালে মুম্বইয়ে জন্ম। জাকির হুসেন ছিলেন প্রখ্যাত তবলা বাদক উস্তাদ আল্লা রাখার পুত্র। সঙ্গীতের প্রতি তাঁর প্রাথমিক আগ্রহ এবং কঠোর প্রশিক্ষণ তাঁকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলা বাদক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। মাত্র তিন বছর বয়স থেকে তাঁর তবলার সফর শুরু। সাত বছর বয়সে একা মঞ্চে অনুষ্ঠান করেন তিনি। সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অসীম ভালোবাসা, সৃজনশীলতা এবং সূক্ষ্মতা তাঁকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পরিচিত করে তোলে। তিনি কেবল একজন সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন না, বরং ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতকে বিশ্ব-দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। জাকির হুসেনের সুর, তাল এবং বাদন নিয়ে তাঁর অসামান্য দক্ষতা এবং সৃষ্টিশীলতা তাকে পৃথিবীজুড়ে শ্রদ্ধার পাত্র করে তোলে। পশ্চিমী ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত, জ্যাজ এবং বিশ্ব সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তিনি অসংখ্য শিল্পীর সাথে সফলভাবে সহযোগিতা করেছেন, যার মধ্যে জর্জ হ্যারিসন, জন মাকলফলিন এবং রবি শঙ্করের মতো বিশিষ্ট শিল্পী রয়েছেন। তাঁর 'শক্তি' নামক যৌথ প্রজেক্ট সংগীতের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে, যা আজও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

একজন শিক্ষক হিসেবে জাকির হুসেন নতুন প্রজন্মের সঙ্গীতশিল্পীদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত নিবেদিত। তাঁর শিক্ষা এবং অনুষ্ঠানগুলো ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত, নির্ভুল এবং গভীর। জাকির হুসেন আন্তর্জাতিক সঙ্গীত উৎসব-সহ বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শিল্পীদের একত্রিত করেছেন, যা সঙ্গীতের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করেছে।

মুসলিম পরিবারের ছেলে জাকির বিয়ে করেছিলেন ভিন্ধর্মে। পরিবারের মত ছাড়াই কত্থকশিল্পী আন্তোনিয়া মিনেকোলাকে বিয়ে করেন তিনি। আলি আকবর খানের সৌজন্যে প্রথম দেখা আন্তোনিয়া ও জাকিরের। প্রথম দেখাতেই তবলাবাদককে বড্ড আপন মনে হয়েছিল আন্তোনিয়ার। সেই সময় যুবক জাকিরের মিষ্টি স্বভাব মন কাড়ে তাঁর। সেখান থেকেই শুরু প্রেম, প্রায় সাত বছরের সম্পর্ক। মুসলিম পরিবারের ছেলে। বাড়িতে তিনিই প্রথম, যাঁর বিয়ে হয় ভিন্ধর্মে। মায়ের আপত্তি ছিল শুরুতে। তাই মায়ের অনুমতি ছাড়াই আন্তোনিয়াকে বিয়ে করেন জাকির। যদিও বাবা সবটাই জানতেন।

সঙ্গীতের জগতে তাঁর অবদানের জন্য জাকির হুসেন অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, যার মধ্যে ভারতের অন্যতম নাগরিক সম্মান, পদ্মবিভূষণ অন্তর্ভুক্ত। জাকির হোসেনকে চেনেন না এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে কম। বিশ্ব ধ্রুপদী সঙ্গীতবাদ্যের জগতে তিনি এক নক্ষত্র। পদ্মশ্রী থেকে শুরু করে পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, গ্র্যামি; সব পুরস্কারই রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। শিল্পীর সম্মানে গর্বিত হিন্দুস্তানি ধ্রুপদী সঙ্গীত জগৎও। ২০২৪ সালেই গ্র্যামি পুরস্কার পেয়েছিলেন জাকির হুসেন। বেস্ট গ্লোবাল মিউজিক অ্যালবাম হিসেবে 'শক্তি' ব্যান্ডের গানের অ্যালবাম 'দিস মোমেন্ট' পুরস্কার পায়। ব্যান্ডের কণ্ঠশিল্পী শঙ্কর মহাদেবন এবং তবলাবাদক ছিলেন তিনি। জুটির হাত ধরেই ২০২৪ সালে ভারতে গ্র্যামি আসে।

তিনি তাঁর স্ত্রী, দুই সন্তান এবং অসংখ্য ছাত্র, অনুরাগী এবং শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যু ভারতীয় তথা বিশ্বের সঙ্গীতের জন্য এক অপূরণীয় শূন্যতা। তাঁর সঙ্গীত এবং তাঁর প্রভাব অমর হয়ে থাকবে অগণিত ভক্ত এবং শ্রোতার মধ্যে।❐

সংবিধান প্রণয়ন : বাবাসাহেব আম্বেদকর ও পন্ডিত জওহরলাল নেহরু

শুভাশিস মজুমদার

.....

জন্মসূত্রে মধ্যপ্রদেশ ও পরিবারগত দিক থেকে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতরত্ন ড. ভিমরাও রামজি আম্বেদকর, যিনি বাবাসাহেব আম্বেদকর নামেই অধিক পরিচিত, যুক্ত থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূত্রে এই বাংলার (অবিভক্ত) সঙ্গে তাঁর সংযোগের কথা হয়ত আমরা অনেকেই জানি না বা বিস্মৃত হয়েছি।

ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, গণপরিষদ (ভারতের সংবিধান রচনার জন্য গঠিত কমিটি) এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৬ সালে। তখনও দেশ স্বাধীন হয়নি।মুসলিম লিগ সংবিধান প্রণয়নকারী গণপরিষদ বয়কট করে।মুসলিম লিগের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে কংগ্রেস দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করায় বড় লাট লর্ড ওয়াভেল গণ পরিষদের অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হন।প্রথম অধিবেশন থেকেই বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণ পরিষদের সভাপতি পদে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত হন। ১৩ ডিসেম্বর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে তদারকি সরকারের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহরু সংবিধানের ' লক্ষ সম্পর্কিত ' বক্তৃতাটি প্রদান করেন।এই বক্তৃতায় ভারতকে 'স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র' বলে ঘোষণা করা হয়।এর নাগরিকদের 'আইন ও জন নৈতিকতার সাপেক্ষে সামাজিক , অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের ; সমমর্যাদা লাভের; সমান সুযোগসুবিধার; আইনের সমবিচারের; চিন্তা ও বক্তব্য প্রকাশের, ধ্যানধারণার ও ধর্মবিশ্বাসের, ইচ্ছামতন কাজ করার, মেলামেশা করার ও সক্রিয় হবার স্বাধীনতার নিশ্চিতি দেওয়া হয়। পাশাপাশি এই আশ্বাস দেওয়া হয় যে সংখ্যালঘুদের , পিছিয়ে- পড়া অনুন্নত শ্রেণির মানুষদের জন্য যথোপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হবে ।ক্ষ্ম এই প্রস্তাব উত্থাপন করার সময় পন্ডিত নেহরু মহাত্মা গান্ধির অনুপ্রেরণার কথা উল্লেখ করেন। তিনি ভারতের গৌরবময় অতীতের কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি ফরাসি , মার্কিন ও রুশ বিপ্লবের কথাও স্মরণ করেন।

গণ পরিষদের বাংলার সদস্যদের যে নামের তালিকা ছিল তার প্রথম ও দ্বিতীয় নাম দুটি ছিল যথাক্রমে শ্রীশরৎ চন্দ্র বোস (বিশিষ্ট আইনজীবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দাদা) ও ড. বি.আর. আম্বেদকর। অবিভক্ত বাংলার যশোর ও খুলনা জেলার তপশিলি সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে বাবাসাহেব আম্বেদকর এই কমিটিতে নির্বাচিত হন। তাঁকে তপশিলি সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় নেতা যোগেন মন্ডল সমর্থন করেন।মুসলিম লীগও তাঁকে সমর্থন করে। অবশ্য, ১৯৪৭ সালে যশোর ও খুলনা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বাবাসাহেব আম্বেদকর ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন বম্বে প্রভিন্স থেকে পুনর্নির্বাচিত হয়ে এই ভারতীয় গণপরিষদে আসেন। এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও গণ পরিষদের সভাপতি ড.রাজেন্দ্র প্রসাদ তৎকালীন অবিভক্ত বম্বে স্টেটের মুখ্যমন্ত্রী বি.জি.খেরকে চিঠি লিখে ড.আম্বেদকরের নির্বাচন সেখান থেকে সুনিশ্চিত করতে বলেন। এম.আর.জয়াকর গণ পরিষদ থেকে পদত্যাগ করে ড.আম্বেদকরকে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ করে দেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হয়। নতুন তদারকি সরকারের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহরু ড. আম্বেদকরের নাম ভারত সরকারের আইনমন্ত্রী পদের জন্য প্রস্তাব করেন।শুধু তাই নয় সংবিধান প্রণয়নকারী গণ পরিষদের ' সংবিধান খসড়া কমিটি 'র সভাপতি পদে ড. আম্বেদকরকে নিয়োগ করা হয়। এই গণপরিষদ এর তত্বাবধানে তৈরি হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও আমাদের গর্বের সংবিধান।

মহাত্মা গান্ধি একদা এই আশা ব্যক্ত করেছিলেন যে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি হবেন একজন অস্পৃশ্যা নারী।কিন্তু তাঁর সেই আশা পূরণ হয়নি। কিন্তু তাঁর অভিপ্রায় পূরণ হয় যখন অস্পৃশ্য জাতিভুক্ত ড. বি. আর. আম্বেদকরকে গণ পরিষদের সংবিধান খসড়া সমিতির সভাপতি র পদ গ্রহণ করার জন্য আহবান জানানো হল।

১৯৪৯ সালের ২৫ নভেম্বর অর্থাৎ গণ পরিষদের অন্তিম অধিবেশনের আগের দিন আম্বেদকর এক মর্মস্পর্শী ভাষণে সংবিধান খসড়া কমিটির কাজকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করেন। তিনি ধন্যবাদ জানান খসড়া কমিটির সকল সদস্যকে, ধন্যবাদ জানান সাহায্যকারী কর্মীদের। এবং তিনি ধন্যবাদ জানালেন সেই পার্টিকে (পড়ুন কংগ্রেস) , তিনি সারা জীবন ধরে যে পার্টির বিরোধিতা করে এসেছেন।তিনি বলেন ''পরিষদ কক্ষের ভিতরে ও বাইরে কংগ্রেসের নেতারা শান্তভাবে কাজ না করে গেলে তাঁর পক্ষে এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা বার করে আনা সম্ভব হত না। কংগ্রেস পার্টির এই শৃঙ্খলার সুবাদেই খসড়া কমিটির পক্ষে প্রত্যেকটি ধারা ও প্রত্যেকটি সংশোধনীর পরিণতি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে খসড়া সংবিধানকে গণ পরিষদে ঠিক মতন চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।" (গাঁধী উত্তর ভারত- রামচন্দ্র গুহ ,পৃষ্ঠা -- ১০৭- ১০৮)

সংবিধান প্রণীত হবার পর ১৯৫০ সালে আইনমন্ত্রী ড. আম্বেদকর প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর পূর্ণ সমর্থন নিয়ে সংসদে ' হিন্দু কোড বিল ' পেশ করেন।যুগান্তকারী এই বিলে হিন্দু পুরুষদের বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয় , সম্পত্তিতে কণ্যা সন্তানদের পুত্র সন্তানদের সঙ্গে সমান উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, আদালতের সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ হয়, অন্যবর্ণের পুত্র বা কণ্যা সন্তানদত্তকনেওয়া আইনসিদ্ধহয়।রক্ষণশীল হিন্দুরা এই বিলেরতীব্র বিরোধিতা করে। আরএসএস , হিন্দু মহাসভা , রাম রাজ্য পরিষদ প্রভৃতি সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার শুরু

করে। তাদের মতে এই বিল হিন্দু ধর্মের ওপর চূড়ান্ত অন্যায় হস্তক্ষেপ। পন্ডিত নেহরু দৃঢ়তার সঙ্গে ড. আম্বেদকরকে সমর্থন করেন। এই সময় রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ পন্ডিত নেহরুকে এই বিল প্রণয়নে তাঁর আপত্তির কথা জানান। পন্ডিত নেহরু বলেন দেশের জনতার সিংহভাগ হিন্দু ও তাঁর শতকরা ৫০ ভাগ নারী। এই বিল প্রণয়নে দেশের মানুষের সমর্থন তাঁর দিকে আছে বলে তিনি মনে করেন।এই সময় রক্ষণশীল হিন্দুরা সকল ধর্মের মানুষের জন্য একই দেওয়ানি আইন বিধি প্রবর্তনের কথা বলেন।এর উত্তরে নেহরুজি বলেন একই দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের জন্যই আমরা সংবিধানে ৪৪ নং ধারা সংযোজন করেছি। হিন্দু কোড বিল ওই কাজের দিকেই অগ্রসর হওয়া। অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে উঠলে এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তন করা হবে।ড. আম্বেদকর বলেন ' হিন্দু কোড বিল ' রচনা করতেই এতগুলি বছর লাগলো , এখন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি রচনা করতে আরো ১০ বছর লেগে যাবে। এই সময় রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে বলেন বর্তমান সংসদ প্রাপ্ত বয়স্কদের সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত নয়। কাজেই সংবিধান অনুযায়ী ১৯৫১-৫২ তে নতুন সংসদ নির্বাচিত হয়ে আসলে সেই সংসদ এই হিন্দু কোড বিল গ্রহণ করলে তা সমীচীন হবে। রাষ্ট্রপতির এই বক্রব্য সমীচীন বলে পন্ডিত নেহেরু মনে করেন।

এর ফলে ড.আম্বেদকর পন্ডিত নেহরুর ওপর খুবই অসন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন পন্ডিত নেহরু আপোষ করছেন। ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাবাসাহেব নেহেরু মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তফা দেন। এরপর তিনি নতুন দল গঠন করে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ওই প্রথম সাধারণ নির্বাচনে হিন্দুত্ববাদী সংঘ পরিবার হিন্দু কোড বিলকে সামনে রেখে তীব্র পন্ডিত নেহরু ও কংগ্রেস বিরোধী প্রচার চালায় । তারা স্লোগান তোলে ' পাকিস্তান তোড় দো , নেহরু হুকুমত ছোড় দো '। কিন্তু নেহরু ও কংগ্রেস বিপুল ভাবে জয়যুক্ত হয়। উল্লেখ্য, ড.আম্বেদকর, বম্বে উত্তর আসনে ১৯৫২ সালের ওই সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী নারায়ণ কাজরলকরের কাছে পরাজিত হলেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে তিনি রাজ্যসভার সদস্য (৩ এপ্রিল,১৯৫২ - ৬ ডিসেম্বর,১৯৫৬) হন এবং আমৃত্যু সদস্য থাকেন। পন্ডিত নেহরুর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালেই তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম আইন ও বিচারমন্ত্রী (১৫ আগস্ট,১৯৪৭-১১ অক্টোবর১৯৫১) হয়েছিলেন।

ড. আম্বেদকর ১৯৫৪ সালে উপ-নির্বাচনে ভাণ্ডারা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়ে লোকসভার সদস্য হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই নির্বাচনে তিনি তৃতীয় স্থান পান এবং জয়ী হন কংগ্রেস প্রার্থী। ১৯৫৭ সালের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের আগেই তিনি প্রয়াত হন (৬ ডিসেম্বর,১৯৫৬)।

ড.বি.আর.আম্বেদকর কখনোই কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন না। তাঁর দল ছিল 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি'। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি কংগ্রেসের এবং গান্ধিজীর কঠোর সমালোচক ছিলেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু গণতন্ত্রের পূজারী পন্ডিত জওহরলাল নেহরু বিরোধী মতামতকে যেমন গুরুত্ব দিতেন, তেমনই বিশেষ ব্যক্তিদের গুণের মর্যাদা দিতেন। চাইতেন দেশ গঠনের কাজে তাঁদেরও অবদান থাকুক। ড.আম্বেদকরকে গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া রচনার শীর্ষপদে রেখে, তাঁকে স্বাধীন ভারতের প্রথম আইন ও বিচারমন্ত্রী করে এবং ১৯৫২ সালে কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পরেও সাদরে ড.আম্বেদকরকে রাজ্যসভার সদস্য করে নিয়ে এসে পন্ডিত নেহরু এর প্রমাণ দিয়েছেন।

ড.বি.আর.আম্বেদকরের অবদানকে সম্মান জানিয়েও উল্লেখ করা যায়, ভারতের সংবিধানের কাঠামো ও মতবাদ পন্ডিত নেহরুর দার্শনিক চিন্তা ও জ্ঞানের প্রতিফলন। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজবাদী দর্শনই ছিল পন্ডিত নেহরুর মতাদর্শ, যা তিনি আমৃত্যু দৃঢ়তার সঙ্গে আগলে রেখেছিলেন। পন্ডিত নেহরু ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ অন্তর্বর্তীকালীন ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। ঐ বছরে ৯ ডিসেম্বর পন্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে গণপরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভায় ড.আম্বেদকর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। ১৫ আগস্ট,১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে গান্ধিজীর সঙ্গে সহমত হয়ে পন্ডিত নেহরু স্বাধীন ভারতের প্রথম আইন ও বিচারমন্ত্রী হিসেবে ড.আম্বেদকরকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে আসেন। একই ভাবে গান্ধিজী এবং পন্ডিত নেহরু সহমত হয়ে ২৯ আগস্ট, ১৯৪৭-এ গণপরিষদের সংবিধান খসড়া রচনা কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় ড.আম্বেদকরকে, যে গণপরিষদের কাজ জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে এবং দার্শনিক ভাবধারায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন বিষয়ের কমিটির মতামত ও পরামর্শ গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা পরে প্রয়োজন মতো পরিমার্জন করে লিপিবদ্ধ করা হতো। ইতিমধ্যেই আমরা জানি, ভারতের সংবিধানের 'প্রস্তাবনা' বা 'প্রিঅ্যামবেল', যা সংবিধানের 'মূল দর্শন বা নীতি', তা ১৩ ডিসেম্বর,১৯৪৬- এ পন্ডিত নেহরু অবতারণা করেন। এই কথা ড.আম্বেদকরের খসড়া রচনা কমিটি স্বীকৃত। সংবিধানের এই প্রস্তাবনা সংবিধানের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্পর্কে নির্দিষ্ট রূপরেখা দেয়।

১৯৭৩ সালে এক যুগান্তকারী রায়ে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এস এস সিকরি বলেন, 'আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনা-র গুরুত্ব অপরিসীম এবং প্রস্তাবনায় ব্যক্ত দর্শন অনুসরণ করে সংবিধানের পঠন-পাঠন ও ব্যাখ্যা করা উচিত।'

এই কথা উল্লেখযোগ্য, সংবিধানের গঠন ও দর্শন যা আমাদের সংবিধানকে স্থায়িত্ব দেয় ও পথ নির্দেশ করে তাহা পন্ডিত নেহরু প্রবর্তিত দর্শন থেকেই পাওয়া যা তিনি ড.আম্বেদকর খসড়া রচনা কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার অনেক আগেই গণপরিষদের সভায় ব্যক্ত করেছিলেন। সংবিধানে বর্ণিত মূল নীতিগুলি ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকারগুলির সর্বত্র পন্ডিত নেহরুর মস্তিষ্ক প্রসুত চিন্তা ও বিজ্ঞতার প্রকাশ স্পষ্ট যা তিনি গণপরিষদের ঐ সভায় আবেগঘন বক্তৃতায় ব্যক্ত করেন। দেশের নাগরিকরাই সর্বশক্তিমান এবং তাদের অধিকার ও সমতা যাতে সুরক্ষিত থাকে এই ব্যাপারে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন, যা আমাদের সংবিধানেও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

গণপরিষদের সভার লিপিবদ্ধ বিবরণ পড়লেও জানা যায়, এর বিতর্কের তারকা বক্তা ছিলেন পন্ডিত নেহরু, অন্য কেউ নন। তাই সংবিধান প্রণয়নে ড.আম্বেদকরের অবদানের প্রতি পূর্ণ সম্মান জানিয়েও বলা যায়, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও সুমহান, ভারতের সংবিধান প্রণয়নের একমাত্র না হলেও অন্যতম মূলকারিগর পন্ডিত জওহরলাল নেহরু।

হিন্দু কোড বিল যা হিন্দু আইনে বিবাহ ও সম্পত্তি বিষয়ে আমূল পরিবর্তন এনেছিল তা ড. আম্বেদকর রচনা করেছিলেন, প্রথম সাধারণ নির্বাচনের আগে ঐ বিল পাশ না করানোর জন্য ড.আম্বেদকর ক্ষুব্ধ হয়ে

পদত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু পন্ডিত নেহরু কথা রেখেছিলেন।তিনি ওই বিশাল বিল পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাগে বন্টন করে সংসদে পাশ করান। ১৯৫৬ সালে ড.আম্বেদকর পরলোক গমন করেন।সংসদে তাঁর একদা

সহকর্মী প্রধানমন্ত্রী নেহরু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে বলেন , ড. আম্বেদকর সবচেয়ে বেশি করে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন ' হিন্দু সমাজের যাবতীয় নিপীড়নমূলক বৈশিষ্টগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে।' শুধু তাই নয়, ' হিন্দু আইন সংস্কারের প্রশ্নে তিনি যে বিপুল আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করেছিলেন সেই কারণেও তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।ভাবতে ভালো লাগছে যে সেই সংস্কারের সার্থক প্রবর্তনের অধিকাংশটাই তিনি দেখে যেতে পারলেন ---- যদিও তাঁর নিজ হস্তে রচিত সেই বিশালকায় রচনাটি হুবহু একই আকারে পাশ হয়নি , হয়েছে টুকরো টুকরো করে।' (রামচন্দ্র গুহ রচিত ' গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ ', পৃষ্ঠা - ২১৫ - ২১৬)

আজ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি এবং তাদের 'বি টিম' দলগুলি দেশের মানুষের ইতিহাস জ্ঞানের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পন্ডিত নেহরুর বিরুদ্ধে যখন কুৎসা রটনায় ব্যস্ত তখন দেশের মানুষের কাছে প্রকৃত সত্যটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে হবে। ❐

বাংলাদেশে সরকারি মদতে সংবাদম্যাম ও সাংবাদিকদের ওপর ক্রমাগত নারকীয় আক্রমণ

....

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাংলাদেশে তথাকথিত জুলাই বিপ্লবের পর রাষ্ট্রীয় মদতে সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকদের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চলছে। সেই সব সংবাদপত্র বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া যারা শেখ হাসিনার সরকারের বহু নীতির সমালোচক ছিল তারাও ইউনুস- জামাত চক্রের আক্রমণ থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। নীচের পরিসংখ্যান গুলির ওপর চোখ বোলালে বোঝা যাবে বাংলাদেশে সাংবাদিকরা কি অবস্থার মধ্যে কাজ করছেন। ২৯৬ জন সাংবাদিকের নামে প্রায় ৬ শতাধিক মামলা, যার অধিকাংশই হত্যা মামলা। আসামী হিসেবে গ্রেফতারকৃত ১৮জনের মধ্যে মাত্র ২জনের জামিন হয়েছে। প্রায় সহস্রাধিক সাংবাদিক ও মিডিয়াকর্মী চাকরিচ্যুত ও বিতাড়িত। ১৬৮জন সাংবাদিকের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল।ঢাকা ও ঢাকার বাইরে ৮৩জন সাংবাদিকের প্রেসক্লাবের সদস্যপদ বাতিল ও স্থগিত। ৬জন সাংবাদিক নিহত এবং অগণিত সাংবাদিক আহত ও লাঞ্ছিত। পঞ্চাশের অধিক টিভি/পত্রিকার অফিস হামলা-ভাংচুরের শিকার। কয়েকটি বাদে প্রায় সবগুলো মিডিয়া হাউজের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব দখল। উপরের এগুলো গত ৫ আগস্টের পূর্বাপর বাংলাদেশের গণমাধ্যমে ঘটে যাওয়া সরকারী তাণ্ডবের খণ্ডচিত্র।

চাকরিচ্যুতি : বাংলাদেশ টেলিভিশন(বিটিভি) থেকেই প্রায় একশ সাংবাদিক ও মিডিয়াকর্মীকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। বেসরকারী নাগরিক টিভি থেকে ৩৯জন, একাত্তর টিভি থেকে আরও ৪ জন ,বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলায় ৩জন, রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া উপজেলায় ৮জন ও বাঘা উপজেলায় ১জন, সিরাজগঞ্জ সদর থানায় ১জন, কুষ্টিয়া সদরে ১৮জন এবং কুমারখালী উপজেলায় ১জন, ঝিনাইদহ উপজেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলায় ১জন, মাগুরা সদর থানায় ৩জন, নড়াইলে ১জন, খুলনার ১৪জনের নামে আইসিটিতে অভিযোগ দেয়া হয়েছে, সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় ১জন, সাতক্ষীরা আমলী আদালতে ৩জন, পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানি উপজেলায় ৩জন, বরগুনা জেলার বামনা উপজেলায় ২জন, বরিশাল জেলার হিজলায় ৬জন, ময়মনসিংহে ১জন, জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলায় ৩জন, শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলায় ১জন, গাজীপুর জেলায় ১০জন, টাঙ্গাইল জেলায় ৩জন, মুন্সিগঞ্জ জেলায় ১জন, রাজবাড়ী জেলায় ৪জন এবং ১জনকে রাজধানীর মিরপুর ও সাভারে আসামী করা হয়েছে, ফরিদপুর জেলায় ১জন, শরীয়তপুরের ১জনকে রাজধানীতে আসামী করা হয়েছে, সুনামগঞ্জ জেলায় ৩জন, মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় ১১জন, হবিগঞ্জ জেলায় ১৫জন, কুমিল্লা জেয়ায় ৩জন, ফেনী জেলায় ২জন, চট্টগ্রাম জেলায় ৩০জন, কক্সবাজার জেলায় ১জন এবং খাগড়াছড়িতে ৬ জনের নামে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাঁরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে ।কারণ আদালত কাউকে জামিন দিচ্ছে না। আর এই আত্মগোপনের সুযোগ নিয়ে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশে গণমাধ্যম বন্ধেরইতিহাস আছে,দখলের নজিরনাই। কিন্তু ৫ আগস্টের পরে বিএনপি, জামায়াত ও বৈষম্যবিরোধীরা মিলে সেই নজিরও সৃষ্টি করেছে। সাংবাদিকদের নামে মামলার ঘটনা নতুন নয়, কিন্তু এরকম গণহারে খুনের মামলায় আসামী করার নজির দুনিয়ার কোথাও না থাকলেও নয়া বন্দোবস্তের বাংলাদেশে সেই নজির সৃষ্টি করে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের চাকরিচ্যুতির নজির আগেও ছিল, কিন্তু নতুন বাংলাদেশে একটি বিশেষ মতাদর্শে বিশ্বাসী এরকম সন্দেহে পেশাদার সাংবাদিক ও মিডিয়াকর্মীদের চাকরিচ্যুতির নজির পৃথিবীর কোথাও নেই।

গত কয়েক মাসে সরকারের মিডিয়া-বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি এবং সরকারের সমর্থক রাজনৈতিক দলোগুলোর ঋণাত্মক কর্মকাণ্ডের পরিণতিতে নতুন গণমাধ্যম সৃষ্টি ও বিকাশে নতুন বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করবে। যা বৈষম্যহীন রাষ্ট্র বিনির্মাণের অন্তরায় হিসেবে গণ্য হবে।

এসবের মধ্য দিয়ে একটা বিষয় পরিস্কার যে, সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলার শেষ মানুষটির মুখও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ছিটেফোঁটাও আর অবশিষ্ট নেই।

এই এই আক্রমণকারীদের কোনও সংস্কৃতি বোধ নেই। নেই কোনো শিক্ষা দীক্ষা। এদের সব বিষয়ে অন্ধ ভাবে সমর্থন করতে হবে। না করলেই তাদের ওপর শুরু হবে আক্রমণ। এরা এখনঈদনিক প্রথম আলো ও ডেইলিস্টার এর ওপরেও ক্ষিপ্ত। তার কারণ তারা অন্ধভাবে এই ধরনের কার্যকলাপ সমর্থন করতে পারছে না। অথচ ওই দুটি সংবাদপত্র শেখ হাসিনার সরকারেরও সমালোচক ছিল। এই জামাতিদের প্রতিবাদের ধরন দেখুন। কয়েকদিন আগে এই জামাত এর ছাত্ররা 'প্রথম আলো' সংবাদপত্রের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে একটি গরু জবাই করে ওখানেই রান্না করে খেয়েছে। কি সুন্দর প্রতিবাদ। ❐

বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধর্মান্ধতাকরণ

সুষুপ্ত পাঠক

.....

লোকসংগীত উৎসব আয়োজনের জন্য আর্মি স্টেডিয়াম বরাদ্দ দিয়েও কর্তৃপক্ষ 'অনিবার্য কারণবশত' সে বরাদ্দ বাতিল করেছে। একই ভেন্যুতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর আয়োজনের জন্য বেঙ্গল ফাউন্ডেশন আবেদন করেছিল। তারাও পিছিয়ে এসেছে।

একই সময়ে একের পর এক পাকিস্তানী শিল্পীদের কনসার্ট আয়োজন হচ্ছে ঢাকায়। ফলে বিষয়টা এমন নয় যে কোন একটা সংগীতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে কেউ। রাহাত ফতে আলী খানের কনসার্টে নামাজের স্থান রাখা হয়েছে। আজানের সময় গান থামিয়ে নামাজের স্থানে নামাজ পড়ে আবার কনসার্ট শুরু হয়েছে। পাকিস্তানী শিল্পীদের এমনিতেই ঈমানের ছিলছিলা বেশি। আতিফ আসলাম ঢাকায় জুম্মার নামাজ পড়েছে। রাস্তা আটকে জুম্মা পড়ার ঐতিহ্য অনুসারে পথে বসে তার নামাজ পড়ার ছবি সোশাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়েছে। কোথাও একটা সুরসুরি দেয়া হচ্ছে। গানাবাজনা নামাজকালাম মিলেমিশে একাকার। বাংলার লোকসংগীতের সঙ্গে এটা একদমই যায় না। ফোক গানের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে কনসার্টে নামাজের স্থানটাই যায় না। এখানে কৃষ্ণ নবী একত্রে এসেছে কোন কোন গানে। এসেছে ঈশ্বরকে কোথাও খুঁজে না পাওয়ার ব্যাকুলতা। আমার মনে হয় এ ধরণের দর্শন যে গানে সেরকম গান আয়োজনে বিশেষ শক্তিশালী একটি কর্তৃপক্ষ রাজি নয়।

২০১৮ সালে আওয়ামী লীগ আমলে হঠাৎ করে লোকসংগীত ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের শীতকালীন উত্সবগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে লীগ সরকারের এইসব আয়োজন বন্ধ ছিল মৌলবাদীদের কাছে নতজানু হওয়ার একটি অংশ। শীতকালীন ওয়াজের বিপরীতে প্রশাসন কোথাও লোকগান বাউল গানের আসরের অনুমতি দিতো না। সরকার পরিবর্তনের পর একই ধারা বহমান আছে তবে রকম একদমই আলাদা। সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

'ইসলামী মৌলবাদ' ও 'মডারেট ইসলাম' এই দুটি শক্তিই ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। শেখ হাসিনার মৌলবাদ পেলেপুষে রাখাই তার সর্বনাশ করেছে। আমরা তখন লিখতাম হাসিনাকে উদ্দশ্য করে 'তোমারে বধিবে যে গোকূলে বাড়িছে সে'। কিন্তু হাসিনা 'কওমী জননী' শুনতেই ভালোবাসতেন। আমাদের কথা শুনেননি।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও শিল্পকলা একাডেমি বাংলাদেশের ৫৩ বছরে এত আলোচিত আগে আর কখনোই হয়নি। সংস্কৃতি মন্ত্রণালায় বস্ত্র মন্ত্রণালয় মত্স মন্ত্রণালয় এগুলো সাধারণ জনগণ 'দুধভাত' হিসেবেই জানে। মানে দলের কোন কোন নেতাকে মন্ত্রীত্ব দিয়ে একটা সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে আর কী। শিল্পকলা একাডেমির পরিচালক কে সেটি সংশ্লিষ্ট জগতের লোকজন ছাড়া কেউ চেনেই না। কিন্তু বর্তমান পেক্ষাপট একদমই আলাদা। দেশের সংস্কৃতিকে মুসলমানিত্ব করতে একটা প্রচেষ্টা মন্ত্রণালয় থেকে হচ্ছে। প্রগতিশীলরা কেন তাদের আড্ডায় পুজা বড়দিনকে রাখে ঈদকে রাখে না এই প্রশ্ন মন্ত্রণালয় তার প্রথম দিনেই করে ফেলেছে। শিল্পকলা একাডেমি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে বলে উষ্মা প্রকাশ করেছে। দেশের সর্বজন মান্য নাট্য ব্যক্তিত্বদের মঞ্চে নাটক করতে দেয়া হয়নি। নাটক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ওদিকে শর্টফিল্ম উত্সবে অযাচিত হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। বাতিল হয়ে গেছে শর্টফিল্ম ও মুক্ত চলচিত্র প্রদর্শনী। বাংলাদেশ শর্টফিল্ম ফোরামকে দখল করতে আলোচিত মন্ত্রণালয় কলকাঠি নাড়ানোর অভিযোগ করেছে খোদ শর্টফিল্ম ফোরামের লোকজনই। তানভীর মোকাম্মেলের কাজের সঙ্গে আমি পরিচিত। তাঁর মুক্তিযুদ্ধ ও দেশভাগ নিয়ে সিনেমা ও প্রামাণ্যচিত্র তাঁকে অবধারিতভাবে ২০২৪ এর বিজয়ী ইসলামী মৌলবাদী ও মডারেট ইসলামকে নাখোশ করেছে। তানভীল মোকাম্মেলের সীমান্তরেখা প্রমাণ্যচিত্র মুসলিম লীগের দেশভাগের ন্যারেটিভের মুখোশ খুলে দেয়। ফলে তাঁকে ও তাঁর সহযোদ্ধাদের অপসারণের চেষ্টা হবে এটাই স্বাভাবিক। যারা ঠিকঠাক একটা সাবান টুথপেস্টের এড বানাতে পারে না তারা সিনেমা জগতের প্রভু হয়ে বসে ছড়ি ঘোরাচ্ছে। এটাই ২০২৪ সালের প্রাপ্তি।

১৯৯৯ সালে বলিউডে মুক্তি পেয়েছিল 'সরফরোশ' সিনেমাটি। সে সিনেমায় পাকিস্তানী গজল গায়ক 'গুলফাম হাসান' নামের একটা চরিত্র থাকে। যে আসলে সংগীতের পাশাপাশি পাকিস্তানের আইএসআইয়ের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। ভারতে সন্ত্রাসবাদের পিছনে তার হাত দেখানো হয়। অনেকেই দাবী করেন এই গুলফাম হাসান চরিত্রটি আসলে পাকিস্তানী গায়ক ওস্তাদ গোলাম আলীকে বুঝানো হয়েছে। সত্য মিথ্যা জানি না। তবে পাকিস্তানীরা যখন গান গাইতে আসে তখনো আমি তাদের বিশ্বাস করতে পারি না! যারা বাংলাদেশে এখন বেছে বেছে কেবল পাকিস্তান থেকে শিল্পী এনে কনসার্ট করাচ্ছে তারাও এ জন্যই করাচ্ছে কারণ শিল্পীরা মুসলমান ও পাকিস্তানী। এই বিবেচনাকারীরাও গান শোনে এবং এতটাই পছন্দ করে যে কনসার্টের আয়োজন করে। তাই গান শুনলেই লোকজন অসাম্প্রদায়িক হয়ে যায় না। এই সব ধর্মীয়ভাবে বিভাজিত লোকজনও গানবাজনার প্রশ্নে ইসলামিক মৌলবাদীদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। তখন তাদেরকে মৌলবাদ বিরোধী প্রগতিশীল মনে করে বসা এই অঞ্চলের মানুষজনদের একটি ঐতিহাসিক ভুল।

বাংলাদেশের প্রগতিশীলরা তাদের উত্তরাধিকার তৈরি করেননি। এখন চার ধাপ পর্যন্ত কেবলই ডানপন্থী। রাহাত ফতে আলীর কনসার্ট শুনতে গিয়ে নামাজ পড়ে আবার গান শুনতে বসা দর্শক-শ্রোতার সাইকোলজি সরফরোশ সিনেমার গুলফান হাসান থেকে বুঝে নিতে পারেন। ❐